# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| মানবতার সেবা সম্পর্কে কুরআনের পবিত্র শিক্ষা | ২ |
| মানবতার সেবা প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র শিক্ষা | ৩ |
| মানবতার সেবা প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ(আ.)-এর পবিত্র শিক্ষা | ৪ |
| রহমতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.), শিশু, নারী, দাস এবং জীবজন্তুদের প্রতি সদ্ব্যবহারের আলোকে | ৫ |
| মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কুরআন করীমের শিক্ষা | ১১ |
| সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং সদয় আচরণ | ১৪ |
| হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর অসাধারণ সেবা | ১৬ |
| জামাতে আহমদীয়ার মানব সেবা সম্পর্কে অন্যান্যদের অভিমত | ২১ |
| জগতবাসীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করতে জামাতে আহমদীয়ার সেবা | ২৪ |
| বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর প্রচেষ্টা | ৩০ |
| সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও মানব সেবায় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অমূল্য উপদেশাবলী | ৩৪ |


সম্পাদকীয়

## হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

## ‘মানবতার সেবক’

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজেকে ‘মানবতার সেবক’ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু মানবতার সেবক হওয়ার তাঁর এই দাবী আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে। যদিও তিনি দৈহিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অনেক মানুষের সেবা করেছেন এবং এমন একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন যা বিগত একশ বছর যাবৎ মানবতার আধ্যাত্মিক সেবার পাশাপাশি দৈহিক বা জাগতিক সেবার কাজেও নিয়োজিত রয়েছে, এতদ্সত্বে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হলেন একজন আধ্যাত্মিক সেবক। হাদীসেও এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে- يُفِيْضُ الْمَالَ حَتّٰى لَا يَقْبَلُهُ اَحَدٌ (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব নুযুলু ঈসা ইবনে মরিয়ম) অর্থাৎ আগমণকারী (মসীহ) ব্যাপকহারে সম্পদ বিতরণ করবেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই সম্পদ গ্রহণ করবে না। যদি এর অর্থ আধ্যাত্মিক সম্পদ করা হয় তবে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়। কেননা, সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আধ্যাত্মিক সম্পদের বিপুল সম্ভার বিতরণ করেছেন, কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তা গ্রহণ অস্বীকার করেছে। যদি এর অর্থ জাগতিক সম্পদ করা হয়, তবে এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয় না, কেননা, মৌলবীরা সেই সম্পদ লুট করার জন্য আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে। কবে মসীহ মওউদ এসে তাদেরকে ধন-সম্পদ দিবেন সেই অপেক্ষায় তারা দিনপাত করছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

“আমাদের অধিকাংশ মৌলবী এই বিভ্রান্তিতে নিপতিত। তাদের ধারণা যে, মাহদীর যুদ্ধের মাধ্যমে এত বিপুল সম্পদ তাদের হাতে আসবে যে তারা সামলাতে পারবে না। আর যেহেতু বর্তমান যুগে এদেশের অধিকাংশ মৌলবী অস্বচ্ছল, এই কারণেও তারা দিনরাত এমন মাহদীর প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে যে, হয়তো এরই মাধ্যমে এই প্রবৃত্তিগত বাসনা গুলি পূর্ণ হবে। এই কারণেই এরা এমন ব্যক্তির শত্রু হয়ে ওঠে যে এমন মাহদীর আগমণকে অস্বীকার করে এবং কালক্ষেপ না করেই তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হয় এবং ইসলামের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে গেছে বলে মনে করা হয়। সুতরাং আমিও এই কারণবশতঃ তাদের দৃষ্টিতে কাফের, কেননা, এমন ঘাতক মাহদী এবং মসীহর আগমণের বিষয়ে আমি বিশ্বাসী নই, বরং আমি এমন অকদর্পশূন্য বিশ্বাসকে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখি।”

(মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ, রূহানী খাযায়েন, ১৫ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

“ আপনাদের নকল মসীহ ও মাহদী আবির্ভুত হয়ে সমস্ত কাফেরকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ আপনাদের হাতে তুলে দিবে এবং আপনাদের যাবতীয় প্রবৃত্তিগত বাসনা পূর্ণ করবে, যেমনটি আপনারা ধারণা করেন। কিন্তু আমি তো আপনাদেরকে পৃথিবীর অপবিত্র সম্পদের পরীক্ষায় ফেলে দিতে এবং আপনাদের প্রবৃত্তিগত আশা-আকাঙ্খা পুরণের পথ খুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবির্ভুত হই নি, বরং আমার আগমণের উদ্দেশ্য হল বর্তমানের যা কিছু ভোগ-বিলাস রয়েছে সেটিকেও কম করে দিয়ে খোদা তা’লার দিকে আকৃষ্ট করা। বস্তুতঃ, আমার আগমণে আপনাদের সমূহ বিপত্তি দেখা দিয়েছে। যেন তেরো শত বছর ধরে লালিত ধন-সম্পদের সমুদয় বাসনা মাটিতে মিশে গেছে বা বলা যেতে পারে কোটি কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হল। ”

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খন্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৯)

ইসলামের আধ্যাত্মিক জীবন প্রাণ ও ধন-সম্পদের কুরবানী দাবি করে। যেরূপ আল্লাহ্ তা’লা কুরআন মজীদে বলেন:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ (তওবা: ১১২)

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ ইসলামের উদ্দেশ্যে বা ভিন্ন বাক্যে আধ্যাত্মিকতাকে টিকিয়ে রাখতে নির্দ্বিধায় প্রাণ ও সম্পদের কুরবানী দিয়েছেন। প্রকৃত ও চিরস্থায় জীবন হল পরলৌকিক জীবন যার তুলনায় ইহলৌকিক জীবন এবং ধন-সম্পদ তুচ্ছ বিষয়। আল্লাহ্ তা’লা কুরআন মজীদে বলেন: অর্থাৎ প্রকৃত জীবন তো পরকালের জীবনই। যদি তারা এটি জানত। অতঃপর তিনি বলেন: وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ অতঃপর তিনি বলেন- تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝ অর্থাৎ তোমরা পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছ, অথচ পরকালই অধিকতর উত্তম ও স্থায়ী। খোদা তা’লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ এই উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে আগমণ করেন যাতে তারা শিরক, কুফরকে এবং ভ্রান্ত আকিদা এবং চিন্তাধারাকে সমূলে উৎপাটন করে মানবজাতির সঙ্গে আল্লাহ্র সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে পরকালের জীবনের দিকে আকৃষ্ট করেন। সৈয়্যাদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই দৃষ্টিকোণ থেকেই নিজেকে মানবতার সেবক রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি (আ.) আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবতার কোন কোন সেবা করেছেন- এই বিষয়ের ব্যপ্তি ও গভীরতা অনন্ত। নীচে তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেবার উল্লেখ করছি। তিনি (আ.) সমগ্র মানবজাতির প্রতি তাঁর প্রিয় রসূল ও মানব্যবর হযরত মহম্মদ (সা.)-এর পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া রূপে আবির্ভুত হয়েছেন। তিনি একদিকে যেমন ইসলামের অভ্যন্তরে সৃষ্ট ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন কুপ্রথার সংশোধন করেন, তেমনি অপরদিকে তিনি অন্যান্য ধর্মের মতবিশ্বাসের ত্রুটিগুলিও তাদের সামনে প্রকাশ করে দেন এবং তাদেরকে প্রেম ও সহানুভুতিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সঠিক পথের দিশা দেন।

* সেই সমস্ত মুসলমানের মতবিশ্বাসের তিনি সংশোধন করেন যারা ঈসা (আ.)কে জীবিত বলে বিশ্বাস করত এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সহকারে তাঁর মৃত্যু সাব্যস্ত করেন। এটি এমন একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যার ভিত্তিতে মুসলনজাতি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে খৃষ্টানদের কাছে পরাস্ত হচ্ছিল আর বিপুল সংখ্যক মুসলমান খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল। কেননা, এই আকিদা মসীহ (আ.)কে হযরত মহম্মদ (সা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ রূপে প্রতিপন্ন করছিল। তিনি এই ভয়াবহ আকিদার সংশোধন করেন।

* তিনি খুনি বা ঘাতক মাহদীর আকিদাকে ভ্রান্ত প্রমান করেন।

* তিনি এই বিশ্বাসের সংশোধন করেন যে, ইসলাম তরবারির বলে প্রসারিত হয়েছে। যদিও এটি খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে ইসলামের উপর এক বিরাট অপবাদ ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুষ্টিমেয় মুসলমানদের মধ্যেও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে থাকে। * নবীগণ জগতবাসীর সামনে খোদার রূপ প্রকাশ করে থকেন। “হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে যুগে আবির্ভুত হয়েছিলেন, সেই সময়ও খোদা তা’লা পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টির

# তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানব জাতির (কল্যাণের জন্য উত্থিত করা হইয়াছে; তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক, এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখ।

# মানবতার সেবা সম্পর্কে কুরআনের পবিত্র শিক্ষা

## আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক।

(সূরা ফাতিহা: ২)

## সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ (آل عمران:111)

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানব জাতির (কল্যাণের জন্য) উত্থিত করা হইয়াছে; তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক, এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখ।

(আলে ইমরান: ১১১)

## পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির এবং সঙ্গীদের প্রতি সদয় আচরণ করার শিক্ষা

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا (النساء:37)

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না এবং সদয় ব্যবহার কর- পিতামাতার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকীন এবং আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশীগণের সহিত এবং সঙ্গীসহচর এবং পথচারীগণের সহিত এবং তোমাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে, তাহাদের সহিত। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন যাহারা অহংকারী, দাম্ভিক।

(আন্ নিসা: ৩৭)

## নিকটাত্মীয়, এতীম, মিসকীন, মুসাফির সাহায্যপ্রার্থনাকারী এবং বন্দীদের জন্য অর্থ ব্যয় করা প্রকৃত পুণ্য

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (البقرہ:178)

ইহা পুণ্যকর্ম নহে যে, তোমরা পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে নিজেদের মুখ ফিরাও, বরং প্রকৃত পুণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ এবং পরকাল এবং ফিরিশতাগণ এবং কিতাবসমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান আনে; এবং সে তাঁহারই প্রেমে আত্মীয় স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীগণের এবং বন্দী মুক্তির জন্য ধন-সম্পদ খরচ করে, এবং তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং নিজেদের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে যখন তাহারা কোন অঙ্গীকার করে, এবং দারিদ্রে এবং কষ্টে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্য্যশীল থাকে, ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা নিজদিগকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং ইহারাই প্রকৃত মুত্তাকী।

(আল-বাকারা: ১৭৮)

## ভাইদের মধ্যে মীমাংসা কর

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (الحجرات:10،11)

এবং যদি মো'মেনদের দুইদল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাইবে; যদি (মীমাংসার পরে) তাহাদের উভয়ের মধ্য হইতে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করিয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে তোমরা সকলে মিলিয়া যে বিদ্রোহ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে। যদি সে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সহিত মীমাংসা করাইয়া দিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। নিশ্চয় মো'মেনগণ পরস্পর ভাইভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর; এবং আল্লাহ্‌র তাকাওয়া অবলম্বন কর, যাহাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়।

(আল হুজরাত: ১০-১১)

## হাসি-বিদ্রূপ, ছিদ্রান্বেষণ, অতিরিক্ত সন্দেহ পোষণ, নাম বিকৃত করা এবং কুৎসা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ (الحجرات:12،13)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! কোন জাতি যেন অন্য জাতিকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে; এবং নারীগণও যেন অন্য নারীগণকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না; এবং একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপাধি দিয়া ডাকিও না। ঈমান আনার পর দোষণীয় নাম (দিয়া ডাকা) বড়ই মন্দ কথা; এবং যাহারা ইহার পর তওবা করিবে না তাহারাই যালেম।

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহকে পরিহার কর, কারণ কতক (ক্ষেত্রে) সন্দেহ পাপ বিশেষ। এবং তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করিও না, এবং একে অপরের পিছনে গীবৎ (কুৎসা) করিয়া বেড়াইও না। তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহার মৃত ভাইয়ের গোশত খাইতে চাহিবে? অবশ্যই তোমরা ইহাকে ঘৃণা করিবে; এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করিও, নিশ্চয় আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

(আল হুজরাত: ১২-১৩)

**দয়া প্রদর্শনকারীদের প্রতি খোদা দয়া করবেন, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা । তোমরা জগতবাসীর প্রতি দয়া কর, তিনি উর্দ্ধলোক থেকে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।**

# মানবতার সেবা প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র শিক্ষা

## সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'লার পরিবার

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم: اَلْخَلْقُ عِیَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَی اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰی عِیَالِهٖ۔

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- " সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার। অতএব আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির মধ্যে সব থেকে প্রিয় সেই যে তাঁর পরিবারের সঙ্গে সদয় আচরণ করে এবং তার যাবতীয় চাহিদার প্রতি যত্নবান হয়। "

(বাইহাকী, ফি শোয়বিল ঈমান)

## জগতবাসীর প্রতি সদয় হও

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ یَبْلُغُ بِهِ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اَلرَّحِمُوْنَ یَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا اَهْلَ الْاَرْضِ یَرْحَمْكُمْ مَنْ فِی السَّمَاءِ۔

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- দয়া প্রদর্শনকারীদের প্রতি খোদা দয়া করবেন, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা । তোমরা জগতবাসীর প্রতি দয়া কর, তিনি উর্দ্ধলোক থেকে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

## তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে যাও

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم: لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا یَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰی بَیْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ: لَا یَظْلِمُهٗ وَلَا یَحْقِرُهٗ وَلَا یَخْذُلُهٗ التَّقْوٰی هٰهُنَا وَیُشِیْرُ اِلٰی صَدْرِهٖ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِیءٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ یَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَالُهٗ وَعِرْضُهٗ۔

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন- একে অপরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ন হয়ো না। একে অপরের ক্ষতি সাধনের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ো না। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ লালন করো না। একে অপরকে পিঠ দেখাইও না অর্থাৎ সম্পর্ক ছিন্ন করে করো না। বরং খোদা তা'লার বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই হয়ে থাক। মুসলমান তার ভাইয়ের উপর অত্যাচার করে না। তাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে না। তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে না। তিনি (সা.) নিজের বক্ষদেশের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন- তাকওয়া এখানে। তিনি (সা.) এই শব্দের তিন বার পুনরাবৃত্তি করেন অতঃপর বলেন- একজন মুসলমানের তার ভাইকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখাই তার দুর্ভাগ্যের জন্য যথেষ্ট। একজন মুসলমানের প্রাণ, সম্পদ, সম্মান ও সম্ভ্রম আরেক মুসলমানের জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ এবং তাকে সম্মান করা আবশ্যক। (মুসলিম কিতাবুস বির ওয়াস সিলা)

## তিনজন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন কঠোর ভর্ৎসনা করা হবে

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ. رَجُلٌ اَعْطٰی بِیْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلٌ اسْتَاْجَرَ اَجِیْرًا فَاسْتَوْفٰی مِنْهُ وَلَمْ یُعْطِهٖ اَجْرَهٗ۔

অনুবাদ: হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন- আল্লাহ্ তা'লা বলেন: তিনজন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আমি কঠোর ভর্ৎসনা করব। একজন হল সেই ব্যক্তি যে, আমার নামে কাউকে আমানত দিয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি সে, যে কোন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করেছে এবং সেই অর্থ নিজে ভক্ষণ করেছে। তৃতীয় ব্যক্তি হল সে যে কাউকে মজদুরি খাটায় আর পুরো কাজ আদায় করে নেওয়ার পর পূর্ব নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেয় না।

( বুখারী, কিতাবুল বুয়ু)

## পিতামাতাকে ভালবাস এবং তাদের প্রতি সদয় হও

عَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِیْهِ نَشَرَ اللّٰهُ عَلَیْهِ كَنَفَهٗ وَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ رِفْقٌ بِالضَّعِیْفِ وَالشَّفَقَةُ عَلَی الْوَالِدَیْنِ وَالْاِحْسَانُ اِلَی الْمَمْلُوْكِ۔ (ترمذی صفۃ القیامۃ)

অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন- যার মধ্যে তিনটি গুণাবলী রয়েছে আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বীয় নিরাপত্তা ও রহমতের চাদরে আবৃত রাখবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। প্রথমটি হল দুর্বলদের প্রতি দয়ালু হওয়া, দ্বিতীয় হল পিতামাতার প্রতি ভালবাসা এবং তৃতীয়টি হল ভৃত্য ও সেবকদের প্রতি সদয় আচরণ করা।

(তিরমিযী, সাফাতুল কিয়ামাহ)

## আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ یُّبْسَطَ عَلَیْهِ رِزْقُهٗ اَوْ یُنْسَاَ فِیْ اَثَرِهٖ فَلْیَصِلْ رَحِمَهٗ۔

অনুবাদ: হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.) কে একথা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি রিযক-এর বিষয়ে স্বচ্ছলতা চায় বা দীর্ঘায়ু ও নিজের খ্যাতি কামনা করে তার উচিত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলা অর্থাৎ আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা।

(মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলা)

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَیْرُ بَیْتٍ فِی الْمُسْلِمِیْنَ بَیْتٌ فِیْهِ یَتِیْمٌ یُحْسَنُ اِلَیْهِ وَشَرُّ بَیْتٍ فِی الْمُسْلِمِیْنَ بَیْتٌ فِیْهِ یَتِیْمٌ یُسَاءُ اِلَیْهِ۔ (ابن ماجہ ابواب الادب، باب حق الیتیم)

## সর্বোত্তম পরিবার হল সেটি যেখানে কোন এতীম থাকলে তার উপর অনুগ্রহ করা হয়

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম পরিবার হল সেটি যেখানে কোন এতীম থাকলে তার উপর অনুগ্রহ করা হয়। আর মুসলমানদের মধ্যে নিকৃষ্টতম পরিবার হল সেটি যেখানে কোন এতীম থাকলে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব, হাক্কুল ইয়াতীম)

## মানুষের ক্ষতি সাধন করা থেকে বিরত থাক

عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ! اَیُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ..... تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلٰی نَفْسِكَ۔

অনুবাদ: হযরত আবু যার (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.) কে জিজ্ঞাসা করি যে, কর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটি? হুযুর (সা.) উত্তর দিলেন- মানুষের ক্ষতি সাধন করা থেকে বিরত থাকা কেননা, এটিও তোমার পক্ষ থেকে একটি সদকা এবং তোমার জন্য উপকারী। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

## সর্বোত্তম সঙ্গী

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَیْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ خَیْرُهُمْ لِصَاحِبِهٖ وَخَیْرُ الْجِیْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَیْرُهُمْ لِجَارِهٖ۔

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন- আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সঙ্গীদের মধ্যে সর্বোত্তম সঙ্গী হল সেই যে নিজের সঙ্গীর জন্য কল্যাণকর আর প্রতিবেশীদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই যে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সদয় আচরণ করে।

(তিরমিযী, কিতাবুল বির ওয়াস সিলা)

**খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি সদয় হও আর যথোচিতভাবে হুকুকুল ইবাদ বা মানুষের অধিকার প্রদান করা উচিত। যারা দরিদ্র মানুষের প্রতি সদাচারী নয় বরং তাদেরকে হেয় জ্ঞান করে, আমি তাদের নিজেরই এই বিপদের সম্মুখীন হওয়া নিয়ে আশঙ্কিত।**

# মানবতার সেবা সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর পবিত্র বাণী

## নিজেদের সহানুভুতিকে কেবল মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখো না।

অহংকারী অপরের প্রতি প্রকৃত সহমর্মী হতে পারে না। সহানুভুতিকে কেবল মুসলমানদের মধ্যেই সীমিত রেখো না, বরং প্রত্যেকের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন কর। একজন হিন্দুর প্রতি যদি সহানুভুতি না দেখাও তবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তার কাছে কিভাবে পৌঁছে দিবে? খোদা সকলের রব্ব বা প্রভু-প্রতিপালক। অবশ্যই মুসলমানদের প্রতি বিশেষভাবে সহানুভুতি রাখ, আর মুত্তাকী এবং পুণ্যবানদের প্রতি আরও বেশি সহানুভুতি প্রদর্শন কর। সম্পদ এবং জগতের মোহে আচ্ছন্ন হয়ো না। এর অর্থ এই নয় যে, ব্যবসা বাণিয্য পরিহার কর। খোদা তা'লা বাণিজ্য করতে নিষেধ করেন না, বরং জগতকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেন। অতএব তোমরা ধর্মকে প্রাধান্য দাও।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৯২)

## খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি অনেক সহৃদয় হও।

আমাদের জামাতকে ভালভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, কখনোই আল্লাহ্ তা'লার এমন প্রতিশ্রুতি নেই যে, তোমাদের মধ্যে কখনো কেউ মৃত্যু বরণ করবে না। খোদা তা'লা বলেন اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ (আর রাদ: ১৮) অতএব যে ব্যক্তি নিজেকে মানবোপকারী সত্ত্বায় পরিণত করবে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের আয়ু বৃদ্ধি করবেন। খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি সদয় হও আর যথোচিতভাবে হুকুকুল ইবাদ বা মানুষের অধিকার প্রদান করা উচিত। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৩)

দুর্বল ভাইয়েদের সাহায্য করা এবং তাদেরকে শক্তিশালী করে তোলাকে রীতি বানিয়ে নেওয়া উচিত। দুই ভাইয়ের মধ্যে যদি একজন সাঁতার জানে আর অপরজন না জানে তবে তা কতটা অস্বস্তিকর বিষয়। তবে কি দ্বিতীয়জনকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করা প্রথম জনের কর্তব্য নয় ? না কি সে তাকে ডুবে যেতে দিবে? তাকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করা তার কর্তব্য। এই কারণেই কুরআন শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى (আল মায়েদা: ৩) দুর্বল ভাইয়েদের সহায়তা কর। কর্মগত, ঈমানগত এবং আর্থিক দুর্বলতাতে তাদের অংশীদার হও। শারিরিক দুর্বলতারও চিকিৎসা কর। কোন জামাত ততক্ষণ পর্যন্ত না জামাত রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সামর্থবানরা দুর্বলদের সহায়তা করে। এর একমাত্র উপায় হল তাদের দুর্বলতা গোপন রাখা। সাহাবাগণকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছিল, নবাগত মুসলিমদের দুর্বলতা দেখে বিরক্ত হয়ো না, কেননা, তোমরাও এমন দুর্বল ছিলে। অনুরূপভাবে আবশ্যক বিষয় হল, ধনীরা দরিদ্রদের সেবা করবে এবং স্নেহ ও ভালবাসাসুলভ আচরণ করবে। দেখ! সেই জামাত জামাত নয় যার সদস্যরা পরস্পরের অধিকার আত্মসাৎ করে আর যখন একত্রে চারজন মিলিত হয় তখন তারা নিজেদের গরীব ভাইয়ের নামে কুৎসা করে এবং দুর্বল ও দরিদ্রদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে, তাদেরকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। এমনটি কখনোই কাম্য নয়। ”

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৬৩)

গ্রাম্য মহিলারা একদিন শিশুদের জন্য ওষুধ নিতে আসে। হুযুর তাদেরকে দেখতে এবং ওষুধ দিতে ব্যস্ত ছিলেন। তা দেখে মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব বলেন, হুযুর এটি তো খুবই কষ্টের কাজ আর এইভাবে আপনার মূল্যবান সময় ব্যয় হয়ে যায়। এর উত্তরে হুযুর (আ.) বলেন:

“ এটিও তো অনুরূপ ধর্মীয় কাজ। এরা অভাবী মানুষ আর এখানে কোন হাসপতাল নেই। আমি তাদের জন্য সমস্ত প্রকারের ইংরেজি এবং ইউনানী ওষুধ আনিয়ে রাখি যেগুলি সময়ে কাজে আসে। এটি অনেক পুণ্যের কাজ। এই সব কাজে মোমেনদেরকে অলস ও উদাসীন হওয়া উচিত নয়। ” (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮)

বস্তুতঃ, আমার বন্ধুরা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সদৃশ। আর এ বিষয়টি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে, একটি ছোট কোন অঙ্গে যেমন, আঙুলে ব্যাথা লাগলে সারা শরীর অস্থির হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ তা'লা ভালভাবে জানেন যে, ঠিক এমনই ভাবে প্রতিটি মূহুর্ত এই চিন্তায় থাকি যে, আমার বন্ধু ও সাথী সঙ্গীরা যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকে। এই সহনুভুতি এবং সহমর্মিতার মধ্যে কোন প্রকার কপটতা নেই, বরং সন্তানের সংখ্যা যতই হোক না কেন যে ভাবে মা তার প্রত্যেক সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত থাকে, অনুরূপভাবে আমি আল্লাহ্র খাতিরে আমার বন্ধুদের জন্য সহানুভুতি রাখি আর এর মধ্যে এমন ব্যকুলতা থাকে যে, যখন আমি কোন বন্ধুর চিঠিতে তার কোন প্রকার কষ্ট বা অসুস্থতার সংবাদ পাই, তখন মনের মধ্যে অস্থিরতা ও উদ্বেগ জন্ম নেয় আর হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আর যতই বন্ধুদের সংখ্যা বাড়তে থাকে সেই অনুপাতে এই দুঃখ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন কোন সময় খালি থাকে যখন কোন প্রকার চিন্তা ও দুঃখ মুক্ত থাকে, কেননা এত বিরাট সংখ্যক মানুষের মধ্যে কেউ না কেউ কোন না কোন দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয় আর সেই সংবাদ শুনে আমার মনে অস্থিরতা ও ব্যকুলতা শুরু হয়ে যায়। আমি বলতে পারি না যে, কতটা সময় আমার দুঃখে অতিবাহিত হ। যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া আর কেউ নেই যে এই সমস্ত দুঃখ-চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে পারে, তাই আমি সবসময় দোয়ায় রত থাকি। আর সর্বপ্রথম দোয়া এটিই হয়ে থাকে যে, আমার বন্ধুদেরকে দুঃখ-চিন্তা থেকে নিরাপদ রেখ, কেননা, এদের দুঃখ-দুর্দশাই আমাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলে। অতঃপর এই দোয়া সম্মিলিতভাবে করা হয় যে, যদি কেউ কোন দুঃখে-কষ্টে থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা তা দূর করুন। সকল উৎসাহ ও উদ্দীপনা আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়ার কাজেই ব্যপৃত থাকে। দোয়ার গ্রহণীয়তায় বড় বড় প্রত্যাশা রয়েছে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৬)

## মানবজাতির উপর সদয় হওয়া অনেক বড় ইবাদত

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লা কিছু মানুষকে বলবেন যে, তোমরা অনেক পুণ্যবান এবং আমি তোমাদের উপর প্রীত হয়েছি, কেননা, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলাম যখন তোমরা আমাকে অন্ন দান করেছিলে। আমাকে তোমরা বস্ত্রদান করেছ যখন কি না আমি বস্ত্রহীন ছিলাম। আমি পিপাসার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে পানি পান করিয়েছ। আমি অসুস্থ ছিলাম আর তোমরা আমার শুশ্রুষার জন্য এসেছিলে। তারা বলবে হে আল্লাহ্! তুমি তো এ সব কিছু থেকে পবিত্র। কবে এমনটি হয়েছিল যখন আমরা তোমার সঙ্গে এমন আচরণ করেছিলাম? তখন আল্লাহ্ তা'লা বলবেন যে, আমার অমুক অমুক বান্দা এমন ছিল যখন তোমরা তাদের সেবা করেছ। পক্ষান্তরে তোমরা আমার সঙ্গেই যেন সেই আচরণ করেছ। অতঃপর আরও একটি দল উপস্থিত হবে যাদের আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছ। আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাকে অভুক্ত রেখেছিলে। পিপাসার্ত ছিলাম কিন্তু পানি দাও নি। বস্ত্রহীন ছিলাম কিন্তু বস্ত্র দাও নি। আমি অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু আমার খোঁজ নাও নি। তখন তারা বলবে হে আল্লাহ! তুমি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র। তোমার এই দশা কবে হয়েছিল যে আমরা তোমার সঙ্গে এমন আচরণ করেছি? এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'লা

এরপর ১৫-এর পাতায়.....

# হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রহমাতুল্লিল আলামীন

## শিশু, নারী, দাস এবং জীব-জন্তুদের প্রতি সদ্ব্যবহারের আলোকে

মূল: মহম্মদ ইব্রাহিম সারোয়ার, মুরুব্বী সিলসিলা, কাদিয়ান অনুবাদ: আজিবুর রহমান, মোবাল্লেগ সিলসিলা

আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআনে হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)কে রহমত এবং দয়ার সাগর বলে আখ্যায়িত করে বলেন-

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ
اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হইতে এক মহান রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমাদের কষ্টে নিপতিত হওয়া তাহার জন্য দুঃসহ, সে তোমাদের অতিশয় শুভাকাঙ্খী মোমিনদের প্রতি সে পরম মমতাশীল ও দয়াময়। (সূরা তওবা: ১২৮)

এটি আল্লাহতা'লার সুন্নত বা চিরাচরিত রীতি হল সে নিজ বান্দাদের হেদায়েতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রত্যেক যুগে এবং প্রয়োজনানুসারে নবী এবং রসূল প্রেরণ করে আসছেন। এবং যেভাবে এই আয়াত অনুসারে وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (সূরা আল আরাফ আয়াত : ১৫৭) অর্থাৎ আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। অনুরূপভাবে তাঁর নবীও রসূলগণও ঐশী শক্তি ও নিজের পবিত্র আচরণের মাধ্যমে নিজ নিজ উম্মত ও জাতির জন্য রহমতের উৎস হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু ধর্মকে পরিপূর্ণতার ঘোষণা দিতে গিয়ে যখন আল্লাহতা'লা খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)কে প্রেরণ করেন তখন পবিত্র কোরআনের এই আয়াত وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ (সূরা আল আম্বিয়া )- এর মাধ্যমে চিরস্থায়ী এক মহান ঐশী পদবীতেও ভূষিত করেছেন। এবং এর ফলশ্রুতিতে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী নিজ জীবনে এইরূপ উৎকৃষ্টতার সঙ্গে পালন করেছেন যে, আপন-পর, বন্ধু ও শত্রু ও প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন নারী ও শিশু প্রভু ও দাস, পশু-পাখি ও গাছপালা সবাইকে সমভাবে নিজ রহমতের কল্যাণে পরিতৃপ্ত করে তুলেছেন।

হাদীসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে যে, **'লাউ লাকা লামা খালাকতুল আফলাক'** (বুখারুল আনোয়ার) অর্থাৎ আল্লাহতা'লা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে সম্বোধন করে বলেছেন যে, হে মুহাম্মদ (সাঃ) যদি তোমাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য না থাকত তাহলে আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও সৃষ্টি করতাম না। এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, জগতের সমস্ত জিনিস হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রহমতের কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হচ্ছে। কেননা তিনি (সাঃ) স্বয়ং এই জগত সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিলেন।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এখন আমি রহমাতুল্লিল আলামিন হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নারী , শিশু দাস এবং পশু পাখির প্রতি করুণা এবং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের ঘটনাবলী এবং কিছু উপদেশাবলী উপস্থাপন করছি। কেননা তাঁর জীবন তো করুণা এবং বিনয়ের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ যেভাবে রাতের আকাশ নক্ষত্ররাজিতে পরিপূর্ণ থাকে। এই সব ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহতা'লা এই পরম পরহিতৈষি এবং দয়ার সাগরের মাধ্যমে জগত ও জগতবাসীর উপর কত করুণা করেছে।

### নারীগণের দুঃখ মোচনকারী নবী

যে যুগে নবী করীম (সাঃ) আবির্ভূত হন সেই যুগে গোটা পৃথিবী বিশেষ করে আরব দেশের আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক, ধার্মিক ও সামাজিক পরিস্থিতি এমন শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যা বর্ণনা করা যায় না। মানুষ নানান ধরনের পাপাচার, ব্যাভিচার এবং মুশরিকানা রীতিনীতি ও অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিল। অধিকাংশ গোষ্ঠী ও জনজাতি কন্যা-সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করত এমনকি তাদের মধ্যে হতে অনেকে তো কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত সমাধিস্থ করত যার প্রমাণ আল্লাহতা'লা স্বয়ং কোরআন মজীদে এইভাবে উল্লেখ করেছেন-

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ
كَظِيْمٌ. يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ

অর্থাৎ যখন তাদের কাউকেও কন্যা-সন্তানের (জন্মের) সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায়। এবং সে মনঃকষ্ট অবদমন করতে থাকে।

তাকে যার সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার অমঙ্গল হেতু লোকদের নিকট হতে সে আত্মগোপন করে বেড়ায়।

(সূরা নহল: ৫৯-৬০)

নারীদেরকে পায়ের জুতার ন্যায় বলে গণ্য করত। অংশীদারদের মাঝে বন্টন হওয়া তাদের ভাগ্য বলে মনে করা হত। যখন আল্লাহতা'লা নবী করীম (সাঃ)কে জগতবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ পাঠান তখন নারীর তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকতেন এমনটি অসম্ভব বিষয় ছিল।

বর্তমান যুগের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল এই যে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে অন্যান্য সুশিক্ষিত ও সভ্য দেশগুলিও নারীদেরকে ঘরের রানি করে রাখার পরিবর্তে নাচগানের আসর সাজানোর মাধ্যম করে নিয়েছে। তাদের নারীত্ব এবং কোমলতাকে পদদলিত করার উদ্দেশ্যে বাজারের শোভা এবং বিপননের সামগ্রী বানিয়ে নিয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে নারীদের সংবেদনশীলতার কারণে পরিশ্রমসাধ্য কাজকর্ম থেকে অব্যহতি দিয়ে কেবল সাংসারিক দায়িত্ব অর্পন করাই হল তাদেরকে পর্দার আদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য।

আজ জগতে বাহ্যতঃ নারীদের অধিকার রক্ষা এবং সমানাধিকারের জন্য সোচ্চার সংগঠনসমূহ এবং GLASS WITH CARE ও LADIES FIRST এর স্লোগানদাতা পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের জানা উচিত যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) আজ থেকে পনেরো শ' বছর পূর্বে নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রতি নিজ উম্মতকে قوارير এবং عليك بالمرءة এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করে গিয়েছেন। সুতরাং তিনি (সাঃ) নারীদেরকে সেই অধিকার প্রদান করেছেন যা জগতের কোন নিয়মাবলী নারীদের অধিকার সংরক্ষণকারী সংস্থা ও সংগঠন আজও পর্যন্ত প্রদান করতে পারেনি। আল্লাহতা'লা আদেশ যে,

بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থাৎ এবং তাদের সহিত সদ্ভাবে বসবাস কর। যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর তাহলে স্মরণ রাখ যে, এমনও হতে পারে যে, তোমরা যে বস্তুকে অপছন্দ কর আল্লাহতা'লা তার মধ্যে কল্যাণ রেখেছেন।

(সূরা নিসা: ২০)

সুতরাং নবী করীম (সাঃ) এই ঐশী আদেশ পালনার্থে নিজ উম্মতকে নারীদের সহিত উত্তম আচরণ এবং সদ্ভাব বজায় রাখার আদেশ দিয়েছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন-

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِيْ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজ স্ত্রীর সহিত উত্তম আচরণ করে এবং আমি আমার পরিবারবর্গের সাথে আচরণের দিক থেকে তোমাদের সবার চাইতে উত্তম।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব)

একদিন এক সফরে নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রীগণও তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। এক কৃষ্ণাঙ্গ দাস 'হদী' পড়তে লাগে যার ফলে উটগুলো দ্রুত বেগে ছুটতে আরম্ভ করে। এবং ভয় হচ্ছিল কোথাও কেউ উট থেকে পড়ে না যায়। এ দেখে তিনি (সাঃ) বললেন- رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيْرِ অর্থাৎ সাবধান! ধীরে চল এরা কাঁচের ন্যায়, কোথাও ভেঙে যেন না যায়। (সহী মুসলিম)

একদিন নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রী হযরত সুফিয়া তাঁর সাথে একই উটে সফর করছিলেন। উট পা পিছলে পড়ে যাওয়ার ফলে তাঁরা দুজনেই পড়ে যান। হযরত তালহা (রাঃ) তাঁর নিকটেই ছিলেন। আঁহযরত (সাঃ)-এর দিকে দৌড়ে আসেন, কিন্তু তিনি (সাঃ) বলেন যে, عَلَيْكَ بِالْمَرْءَةِ اَلْمَرْءَةُ اَلْمَرْءَةُ অর্থাৎ প্রথমে মহিলাদেরকে দেখ।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) কখনো কোন কটু কথা নিজের মুখে আনেন

নি। তিনি আরো বলেন যে, তিনি (সাঃ) সমস্ত লোকের চেয়ে বেশি কোমল হৃদয় এবং দয়ালু ছিলেন। সাধারণ লোকদের মত অবাধ জীবন যাপন করতেন। তাঁর চেহারায় কখনো রাগের চিহ্ন দেখা যেত না। সর্বদা হাসি মুখে থাকতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আরো বলেন যে, সারাজীবন নবী করীম (সাঃ) কোন দাস বা স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেন নি।

(সামাইলুত তিরমীযি, বাব ফী খুলকে রসূলুল্লাহ)

হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর জীবদ্দশাতে এবং তাঁর মুত্যুর পরও কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি (সাঃ) কোন বিবাহ করেন নি। এবং সর্বদা ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার আবেগ নিয়ে হযরত খাদিজা (রাঃ)-র ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহারকে স্মরণ করতেন। নবী করীম (সাঃ)এর সমস্ত সন্তানা যা হযরত খাদিজা (রাঃ)এর গর্ভ থেকে ছিল তাদের তরবিয়ত ও দেখাশোনার যত্ন নিতে কোন ত্রুটি রাখেন নি। শুধুমাত্র তাদের অধিকার প্রদানই করতেন না বরং হযরত খাদিজা (রাঃ) এর আমানত বলে গণ্য করে তাদের সহিত অতি উত্তম ভালোবাসার আচরণ করতেন। হযরত খাদিজা (রাঃ)-র বোন হালার কণ্ঠস্বর শোনা মাত্রই তাকে স্বাগত জানানোর জন্য তিনি (সাঃ) দাঁড়িয়ে যেতেন এবং আনন্দিত হয়ে বলতেন যে, দেখ খাদিজার বোন হালা এসেছে। বাড়ীতে যদি কোন পশু জবাই হত তার মাংস হযরত খাদিজার বান্ধবীদের পাঠানোর আদেশ দিতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন যে, কখনো কখনো আমি বিরক্ত হয়ে বলে দিতাম যে, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ) আল্লাহতা'লা আপনাকে এত সুন্দর সুন্দর স্ত্রী দান করেছেন এখন তো সেই বৃদ্ধাকে স্মরণ করা ছেড়ে দিন। তিনি (সাঃ) বলতেন যে, না ! না ! খাদিজা সেই সময় আমার সঙ্গী ছিল যখন আমি অসহায় ও আশ্রয়হীন ছিলাম। সে নিজের সম্পদ সহিত আমার জন্য উৎসর্গিত হয়েছিল। এবং আল্লাহতা'লা তার মাধ্যমে আমাকে সন্তান দান করেছেন। সে আমাকে সেই সময় সত্যবাদী রূপে গ্রহণ করেছিল যখন লোকেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

(মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ফাযায়েল খাদিজা)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন অমি নব বিবাহিতা রূপে নবী করীম (সাঃ) এর বাড়ীতে আসি তখন অমি তাঁর বাড়ীতে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম এবং আমার বান্ধবীরাও আমার সঙ্গে খেলা করত যখন হুযুর (সাঃ) ঘরে আসতেন (তখন আমরা খেলতে থাকা অবস্থায়) আমার বান্ধবীরা তাঁকে দেখে এদিক ওদিক লুকিয়ে পড়তো কিন্তু হুযুর (সাঃ) তাদেরকে একত্রিত করে আমার কাছে নিয়ে আসতেন এবং তারা আমার সাথে খেলা অব্যাহত রাখত। (বুখারী শরীফ কিতাবুল আদব বাব আল আম্বীসাত ইলাননাস)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে ভালোভাবে লালন পালন ও তরবিয়ত করে, সে এবং আমি জান্নাতে এইরূপ প্রবেশ করবো যেভাবে এই দুই আঙ্গুল। এই বলে তিনি (সাঃ) নিজের দুই আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত করেন।

(তিরমীযি, বাব মা জাআ ফিননাফকাতে আলাল বানাত)

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) মহিলাদেরকে প্রহার করা বা কোন প্রকারের কষ্ট দিতে কঠোর ভাবে নিষেধ করতেন। সুতরাং এক জায়গায় তিনি (সাঃ) বলেন যে, তোমাদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি যেন নিজ স্ত্রীকে এমনভাবে প্রহার না করে যেভাবে দাসদাসীদের প্রহার করা হয় আর পরের দিনই দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে পুনরায় তার কাছে পৌঁছে যায়।

(বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্ )

আঁ হযরত (সাঃ) এর কন্যা হযরত ফাতেমা যখন হুযুর (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতেন তখন হুযুর (সাঃ) দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানাতেন। এবং তার হাত চুম্বন করে নিজের জায়গায় বসাতেন।

(সুনান তিরমীযি, কিতাবুল মানাকেব)

দয়ার সাগর রহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজ চাচা হযরত হামজা (রাঃ)-র কলিজা চর্বনকারিনী হিন্দাকেও মক্কা বিজয়ের সময় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করে দেন, প্রতিদিন তাঁর উপর নোংরা নিক্ষেপকারিনী বুড়িমাকেও ক্ষমা করে দেন। এমনকি তার অসুস্থ অবস্থায় তার সেবা-শুশ্রুষার জন্যও যান। এক বৃদ্ধার বোঝা নিজের মাথায় করে তার ঘরে পৌঁছে দেন। যখন সে মুহাম্মদ নামে এক জাদুকর থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেন তখন তিনি (সাঃ) অতি নমনীয়তার সহিত নিজের পরিচয় দেন যে, আমিই সেই মুহাম্মদ (সাঃ)। তখন সে আশ্চর্য হয়ে বলে যে, তবে তোমার জাদু নিশ্চয় আমাকেও মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এবং তৎক্ষণাৎ সে বয়আত করে মুসলমান হয়ে যায়। অনুরূপভাবে এক ইহুদী মহিলা চরকেও তিনি (সা.) নিজ কৃপাগুণে ক্ষমা করে দেন, যে মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল ।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মৃত্যুশয্যায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে বলেন যে, শোন আয়েশা! আমি এখনও সেই বিষের কষ্ট অনুভব করছি যা 'খায়বার'-এ ইহুদীরা এক মহিলার মাধ্যমে আমাকে পান করিয়েছিল এবং আজও আমার শরীর সেই বিষের জ্বালা ও যন্ত্রনা ভোগ করছে। কিন্তু প্রিয় নবী (সাঃ) নিজের জন্য কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তিনি (সাঃ) সেই মহিলাকেও ক্ষমা করে দেন।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

জীবনের শেষবেলায় বিদায় হজ্জের সময় প্রিয় নবী (সাঃ) নিজ উম্মতকে যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী প্রদান করেছেন তার মধ্যে এটিও একটি ছিল যে, নারীদের সাথে যেন উত্তম আচরণ করা হয়। তিনি (সাঃ) যে, স্বয়ং রহমত ছিলেন তার প্রমাণ উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায়। প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধেও মহিলাও শিশুদেরকে আঘাত পৌঁছাতে এবং হত্যা করতে নিষেধ করতেন। নবী করীম (সাঃ) মুসলমান সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা করার সময় এই ব্যাপারে বিশেষ করে তাকিদ করতেন। এমনকি তিনি (সাঃ) বলতেন যে, শস্যক্ষেত ও গাছপালার কোন ধরনের ক্ষতি করবে না। এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) এর দয়ার পরিধি কতটা ব্যপক ও বিস্তৃত ছিল যে, ছোট থেকে ছোট জিনিসেরও তিনি কিভাবে খেয়াল রাখতেন।

হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা (রাঃ) নিজের রচিত এক পদ্যের মাধ্যমে এই অবস্থার কথা উল্লেখ করে এবং সেই মহান নবীর সমীপে দুরূদ ও সালাম প্রেরণের নসীহত করতে গিয়ে বলেন-

**অনুবাদ: 'তুমি সেই মহান রসূলের প্রতি দিনে শত শত বার দরূদ প্রেরণ কর যিনি নবীগণের সর্দার মুহাম্মদ (সাঃ) নামে আখ্যায়িত।'**

নবী করীম (সাঃ) এর এই দয়া ও অনুগ্রহ শুধুমাত্র নিজ স্ত্রীগণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি (সাঃ) নিজ উম্মতকে সমস্ত নারীদের প্রতি এই উত্তম আচরণের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি (সাঃ) কন্যা সন্তানদের অধিকার রক্ষা করেছেন। তাদের তরবিয়ত ও এর উপর ব্যায় করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি (সাঃ) শুধুমাত্র কন্যা সন্তানদের জীবিত থাকার অধিকার প্রদান করেন নি এবং শুধুমাত্র তাদেরকে আশিসের ভান্ডার ও রহমত নাযিলের মাধ্যমে আখ্যায়িত করেন নি বরং তাদের সঠিকভাবে লালন পালন ও তরবিয়তকে জান্নাতে প্রবেশ করার উপায় বলে আখ্যায়িত করেছেন। নারীদের প্রতি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) এর এটিও এক মহান করুণা যে, তিনি (সাঃ) নিজ উম্মতকে মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত আছে বলে সুসংবাদ প্রদান করেছেন। স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহারের এইরূপ গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন যে, তার মুখে একমুঠো অন্ন জোগানোকেও পুণ্যার্জনের মাধ্যম বলেছেন। এক কথায় আঁ হযরত (সাঃ) নারীদেরকে লাঞ্ছনার গহ্বর থেকে বের করে এনে সম্মানের মুকুট পরিধান করিয়েছেন। মা, বৌমা, শাশুড়ী এবং স্ত্রী হিসেবে তাদের অধিকার প্রদান করেছেন। এবং তাদেরকে সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন।

মোটকথা ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নারীদেরকে তাদের যাবতীয় অধিকার দিয়েছে। তাকে শিক্ষার্জনের অধিকার দিয়েছে, বিয়ের পূর্বে হবু স্বামীকে দেখে পছন্দ ও অপছন্দের অধিকার দিয়েছে। এমনকি পিতার অভিভাবকত্ব সত্ত্বেও কন্যার সম্মতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নারীদের অধিকার যেন কেউ খর্ব করতে না পারে তার জন্য ঘোষণা পূর্বক বিবাহের অদেশ দেওয়া হয়েছে। এবং সঙ্গেই তার অধিকার রক্ষার্থে হক মোহর অনিবার্য করে দেওয়া হয়েছে। তাদের যাবতীয় ব্যায়ভারের দায়-দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে তাদের আয়-উপার্জন ও সম্পদের উপর শুধুমাত্র তাদেরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছে। তবে নারীদের নিজ ইচ্ছানুযায়ী ঘরের খরচাদি করার অধিকার রয়েছে। বিধবাদেরকে নিজের স্বামী নিজেই নির্বাচন করার অধিকার দিয়েছেন। যেকোন পারিবারিক বিবাদের ব্যাপারে সেই বিষয়কে কাযা দপ্তর বা বিচার বিভাগে নিয়ে যাওয়ার অধিকার প্রদান করেছেন। পুরুষদের অযথা অত্যাচারে 'খোলা' নিয়ে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অধিকার প্রদান করেছেন। পিতা, মাতা, স্বামী ও ছেলের সম্পত্তির অংশীদারের অধিকার প্রদান করেছেন। ধর্মীয় বিষয়াদিও সভায় অংশ গ্রহণ ও সাক্ষী দেওয়ার অধিকারও প্রদান করেছেন। প্রয়োজনে মহিলাদেরকে তাদের নিজেদের ইমামতীর অধিকার প্রদান করেছেন। নিজের সম্পদের উপর তাদেরই অধিকার প্রদান করেছেন। সময় ক্ষেত্রে পর্দার দিকে লক্ষ্য রেখে কাজকর্ম করার অধিকারও প্রদান করেছেন। দেশ ও সামাজিক বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করার এবং পরামর্শ দেওয়ার অধিকার প্রদান করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ ও সেবা করার অধিকার প্রদান করেছেন। সমস্ত ধরনের ইবাদত (নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ) করা এবং আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে উপনীত হওয়ার অধিকার প্রদান করেছেন।

মিশকাত কিতাবুল নিকাহ্তে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেখানে উল্লেখিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) এর সদ্ব্যবহার ও নারীদেরকে তাদের সমস্ত অধিকার প্রদান এবং ন্যায় বিচারের ফলে সাহাবাগণের মধ্যেও এই চেতনা জাগ্রত হয় যে, তিনি (সাঃ) তো নারীদেরকে এতটাই পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন যে তারা যেকোন ভাবে নিজেদের অধিকার চাইতে (আবেদন করতে) পারে। সুতরাং মহিলারা নবী করীম (সাঃ) এর নিকট নিঃসঙ্কোচে অভিযোগ নিয়ে আসত।

এরপর ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা ও ইসলাম ধর্মের নিন্দুকরা এই অভিযোগ করে যে, ইসলাম ধর্ম নারীদের অধিকার খর্ব করেছে। আজকাল দুই একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের ছুতোয় কিছু নামধারী দল সমনাধিকার প্রদানের নামে বিভিন্ন দেশীয় বৈঠকে ইসলামী পর্দাকে নিষিদ্ধ করার আলোচনা হয়ে থাকে। কিছু দেশ তো এই ব্যাপারে চেষ্টায় রত আছে। এমনকি কিছু দেশ তো এই ব্যাপারে 'উদারতা' দেখিয়ে এর বিরুদ্ধে আইন তৈরী করে নিয়েছে যে, কোন মুসলিম মহিলা এখন দেশীয় নিয়মাবলীর অধীনে ইসলামি পর্দা পরিধান করতে পারবে না। এর কারণ হল যেভাবে তারা নিজেদের ঘরের বউদের বাজারের শোভা বানিয়ে রেখেছে অনুরূপভাবে মুসলমান নারীদেরকেও সেই পাপের ভাগীদার করতে চাইছে, যাতে তাদের সৎ প্রকৃতির নারীরা মুসলমান নারীরদের সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে কোন পরিচয় না ঘটে।

কিন্তু আসল কথা হল ইসলাম সেই একমাত্র ধর্ম যা নারীদেরকে তাদের সামর্থ্য ও প্রাকৃতিক গঠন অনুযায়ী সমস্ত অধিকার প্রদান করেছে। পর্দা নারীদের অধিকার এবং আজ তাদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী চক্রান্ত চলছে। সুতরাং আমাদের বর্তমান ইমাম হযরত আমিরুল মোমিনীন খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম বারংবার এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, এবং নিজের মূল্যবান খুতবা ও ভাষণের মাধ্যমে আহমদী নারীদেরকে হীনমন্যতার শিকার না হয়ে ইসলালামী পন্থাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে শিক্ষার্জন করার এবং পরিবারিক বিষয়াদী এবং বিভিন্ন সেবা করে জগতের সামনে এক ইতিবাচক বার্তা উপস্থাপন করার উপদেশ দিচ্ছেন।

## শিশুদের জন্য (বাচ্চাদের জন্য) রহমত স্বরূপ

শৈশবকাল অজ্ঞানতার যুগ হয়ে থাকে, সেই সময়টা শিশুদের জন্য বড়দের দয়া ও করুণার প্রয়োজন পড়ে। শিশুরা তাদেরকেই হিতৈষী বলে মনে করে যারা তাদেরকে কাছে রাখে এবং আদর যত্ন করে। তরবিয়তের যে উত্তম সুযোগ ভালোবাসার মাধ্যমে সম্ভব, তিরস্কার ও কঠোরতার মাধ্যমে তার কোন আশাও করা যেতে পারে না। সেইজন্য নবী করীম (সাঃ) -এর আজীবন এই রীতিই ছিল যে, শিশুদেরকে নিজের নিকটতম করে রাখতেন। এমনকি তাদের খেলাধূলার প্রতিও দৃষ্টি রাখতেন। সুতরাং তিনি (সা.) নিজ সন্তান ও নাতি ও অন্যান্য শিশুদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাদাদ (রাঃ) নিজের পিতার কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেন যে, একদিন নবী করীম (সাঃ) নামাযে হযরত হাসান বা হুসেনকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। তিনি (সাঃ) নামায পড়ান এবং দীর্ঘ সেজদা করেন। হযরত শাদাদ (রাঃ) বলে যে, আমি মাথা তুলে দেখছি যে, সেই শিশু নবী করীম (সাঃ) এর পিঠে চেপে আছে এবং প্রিয় নবী (সাঃ) সেজদারত অবস্থায় রয়েছেন। সুতরাং আমি পুনরায় সেজদারত হয়ে যাই, নামায শেষে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন যে, হুজুর আপনি যখন সেজদা দীর্ঘ করছিলেন আমরা ভেবেছিলাম যে, নিশ্চয় কোন কিছু ঘটেছে কিম্বা আপনার উপর ওহী নাযেল হচ্ছে। তখন তিনি (সাঃ) বললেন যে, এধরনের কোন কিছুই হয়নি। বরং আমার নাতি আমার পিঠে চেপে বসেছিল। এবং আমি বাচ্চার ইচ্ছা পুরণ না করেই সিজদা শেষ করাকে উচিত মনে করলাম না। এই কারণেই সেজদা দীর্ঘ করছিলাম।

(মসনদ আহমদ,হাদীস নং-১৬০৩৩)

নবী করীম (সাঃ) এর পুত্র হযরত ইব্রাহীম যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি (সাঃ) অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল। হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, হুজুর আপনার চোখেও জল? তখন তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন যে, হে ইবনে আওফ! এসব তো রহমত, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, চোখ অশ্রুসিক্ত এবং হৃদয় বেদনাক্লিষ্ট, কিন্তু এই কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতেও আমরা সেই কথাই বলব যাতে আল্লাহতা'লা সন্তুষ্ট হয়ে যান। এবং তিনি (সাঃ) বলেন যে, হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার মৃত্যুতে দুঃখিত।

(বুখারী, বাব কাওলুন্নাবী)

এই অবস্থা দেখে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, পরিবারবর্গের প্রতি তাঁর চেয়ে বেশি দয়াবান ব্যক্তি আর দেখি নি।

(মুসলিম শরীফ,হাদীস নং-২৩১৬)

একদিন নবী করীম (সাঃ) মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক ইহুদী শিশুর শুশ্রুষার জন্য যান, তার অবস্থা দেখে তিনি (সাঃ) তাকে কলেমা পাঠ করতে বললেন, পিতার সম্মতি দেখে সে কলেমা পাঠ করে। তখন তিনি (সাঃ) তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার সুসংবাদ প্রদান করে বলেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْقَذَهٗ مِنَ النَّارِ এবং এভাবে এই দুজাহানের রহমত নিজ সিফারিসের অধিকারের মাধ্যমে তার প্রতি অনুগ্রহ করেন। (বুখারী)

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন ঘরে আসতেন তখন বাচ্চারা তাঁকে দেখে তাঁর নিকটে আসত। তিনি (সাঃ)ও তাদেরকে উট বা ঘোড়ার আগে পিছে চাপিয়ে নিতেন। একদিন এক গ্রাম্য লোক এসে দেখে যে, নবী করীম (সাঃ) বাচ্চাদেরকে আদর করছেন। এই দেখে সে বলে যে হুজুর , আমার তো অনেক ছেলে মেয়ে আছে। আমি তো কখনো তাদেরকে আদর করিনি। তখন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন যে, যদি খোদাতা'লা তোমার হৃদয় থেকে স্নেহ ও দয়ামায়া ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন তবে তাতে আমার কি করার আছে? তিনি বলেন যে, যে কারোর উপর দয়া করে না খোদাতা'লাও তার উপর দয়া করেন না।

(আল আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী)

প্রিয় নবী (সাঃ) শিশুদেরকে খুব আদর যত্ন করতেন এবং তাদের সহিত অতি উত্তম আচরণ করতেন। যখনই তাদের পাশ দিয়ে যেতেন তাদেরকে সালাম ও সাক্ষাত করতেন। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, কিছু বাচ্চা খেলাধূলা করছিল তখন হুজুর (সাঃ) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাদেরকে প্রথমে সালাম করলেন

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাম)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, উত্তম আচরণের দিক থেকে নবী করীম (সাঃ) সবার উর্দ্ধে ছিলেন। একদিন নবী (সাঃ) আমাকে কোন কাজের জন্য পাঠান আমি তখন পরিষ্কার বলে দিই যে, খোদার কসম আমি কখনো যাব না। কিন্তু আমার অন্তরে এটি ছিল যে, আমি অবশ্যই সেই কাজ করব যার আদেশ প্রিয় নবী (সাঃ) আমাকে দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, আমি নবী করীম (সাঃ) এর আদেশ পালনার্থে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি, কিন্তু পথিমধ্যে বাজারে কিছু বাচ্চাদেরকে খেলাধূলা করতে দেখে আমিও তাদের সাথে খেলতে লাগলাম। হঠাৎ প্রিয় নবী (সাঃ) পিছন দিক থেকে আমার ঘাড়ে হাত রাখলেন। আমি পিছন

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম যে নবী করীম (সাঃ) হাসছেন। তিনি বললেন যে, ইনাইশ (ভালোবেসে ডাকছেন) যে কাজের জন্য পাঠিয়েছি সেখানে চলে যাও। আমিও বললাম যে, জি হুজুর অবশ্যই যাই।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বাচ্চাদের সাথে খুবই উদার এবং খোলামেলা আচরণ করতেন। তাদেরকে ভালোবাসতেন তাদের সাথে হাসি ঠাট্টা করতেন এবং তাদেরকে খুব আদর যত্ন ও স্নেহ করতেন।

হযরত জাবির বিন সালমা (রাঃ) বলেন যে, আমি আঁহযরত (সাঃ) এর সাথে ফজরের নামায পড়েছি নামাজে হুযুর (সাঃ) নিজের ঘরে যাচ্ছিলেন। আমিও হুজুরের সঙ্গ নিই। সেখানে গিয়ে দেখি যে, বাচ্চারা প্রিয় নবীর স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। হুযুর (সাঃ) তাদের কাছে দাঁড়ালেন এবং এক এক করে সবার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। তিনি বলেন যে, আমি তো হুজুরের সঙ্গেই ছিলাম তবুও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। আমি হুজুর (সাঃ)এর হাতের স্নিগ্ধতা ও সুগন্ধ অনুভব করছিলাম যেন সেই হাত কোন সুগন্ধির থলে থেকে বের করা হয়েছে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)

হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদিন আমরা মসজিদ নববীতে নবী করীম (সাঃ) এর জন্য যোহর বা আসরের নামাজের জন্য অপেক্ষা করছিলাম ইতিপূর্বে হযরত বেলাল (রাঃ)ও হুযুর (সা.) কে নামাজের খবর দিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর অপেক্ষায় অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছিল। আমরা অপেক্ষায় বসে ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ দেখি হুযুর (সাঃ) এর নিজ কন্যা জয়নাবের মেয়ে ইমামাকে কাঁধে করে নিয়ে নামাজের জন্য আসলেন। হুযুর (সাঃ) ইমামাকে কাঁধে নিয়ে মুসল্লায় দাঁড়িয়ে যান আমরাও হুজুরের পিছনে দাঁড়িয়ে যাই। কিন্তু ইমামা সেভাবেই নবী (সাঃ)এর কাঁধে বসেছিল এই অবস্থাতেই হুজুর তকবীর পড়ে নামায আরম্ভ করে দেন। এবং আমরাও আল্লহু আকবর বলে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাই হুজুর (সাঃ) ইমামাকে নিয়ে সেজদা করলেন যখন সেজদা থেকে উঠে কেয়ামের জন্য দাঁড়ান তখন পুনরায় ইমামাকে কাঁধে বসিয়ে নেন এভাবে গোটা নামায হুজুর এরূপ করতে থাকেন রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তাকে নামিয়ে বসিয়ে দিতেন এবং সেজদা থেকে উঠে যখন কেয়ামের জন্য দাঁড়াতেন তখন পুনরায় তাকে কাঁধে তুলে নিতেন এ ভাবেই তিনি নামাজ শেষ করেন।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)

হযরত সাহাল বিন সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী করীম (সাঃ) এর মজলিসে কোন পানীয় জিনিস আনা হয়, তিনি (সাঃ) মধ্য থেকে কিছু পান করে দেখেন যে, তাঁর ডান দিকে এক শিশু এবং বাঁদিকে এক সাহাবা দাঁড়িয়ে আছেন। মহানবী (সাঃ) সেই শিশুটির নিকট অনুমতি চান যে, যদি তোমার অনুমতি হয় তাহলে একে বড়দেরকে দিচ্ছি। সে শিশুটি বলে যে, না খোদার কসম আমি (আপনার তাবারক থেকে) আমার অধিকারের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেবনা। এই শুনে নবী করীম (সাঃ) সেই কাপ তার হাতে তুলে দিলেন।

(বুখারী, হাদীস নং-২৩৬৬)

এই হাদীসে এই কথা দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) বাচ্চাদের অধিকার প্রদানের প্রতি কতটা সচেতন ছিলেন। আমাদের জন্য এতে পরিষ্কার নসিহত রয়েছে যে, বাচ্চাদের অধিকার সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের অধিকার প্রদানকে অভ্যাসে পরিণত করা উচিত।

হযরত উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সাঃ) এর কন্যা হযরত জয়নাব মহম্মদ (সাঃ)কে খবর পাঠান যে আমার ছেলে খুব অসুস্থ। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে আপনি দয়া করে আসুন। হুজুর (সাঃ) তাকে খবর পাঠান যে ধৈর্য ধারণ কর। যা কিছু আল্লাহতা'লা দান করেন এবং ফিরিয়ে নেন তা সব কিছুই আল্লাহর সম্পদ। প্রত্যেক জিনিস তার নিকট এক নির্ধারিত সময়ের জন্য হয়ে থাকে। পুণ্যার্জনের জন্য ধৈর্য ধারণ কর [আমার ধারণা এই যে, নবীকরীম (সাঃ) এর বারণ করার কারণ এই ছিল যে, হুজুর (সাঃ) শিশুদের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না]। যাইহোক হযরত জয়নাব পুনরায় খবর পাঠান এবং কসম খেয়ে বলেন যে, হুজুর আপনাকে যে আসতেই হবে। তখন প্রিয় নবী (সাঃ) মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ান এবং তাঁর সঙ্গে সাদ বিন উবাদা, মায বিন জাবাল, যায়ীদ বিন সাবিত (রাঃ) এরা সবাই উঠে রওনা দিলেন। যখন তিনি (সাঃ) হযরত জয়নাবের ঘরে উপস্থিত হন তখন শিশুটি তাঁর কোলে দেওয়া হয়। নিঃশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল এবং কোন পানি ভর্তি ঘটি থেকে পানি বেরলে যে ধরনের শব্দ হয় ঠিক তেমনই শব্দ তার নিঃশ্বাসে ছিল। নবী করীম (সাঃ) শিশুটিকে কোলে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখতেই চোখ দিয়ে অশ্রু বইতে আরম্ভ হয়ে যায়। হযরত সাদ (রাঃ) বললেন যে, আল্লাহর রসূল আপনি কেন কাঁদছেন? দয়ার সাগর রহমাতুল্লিল আলামিন উত্তর দিলেন যে এইসব সেই দয়ার আবেগ যা খোদাতা'লা নিজ বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। খোদাতা'লা নিজ বান্দাদের মধ্য হতে তাদের উপরে দয়া ও করুণা বর্ষণ করেন যারা নিজেরাও দয়া ও করুণার আচরণ করে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয)

হযরত যায়ীদ (রাঃ) হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর পালিত পুত্র ছিলেন যাঁর কথা পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ হয়েছে। এবং সে একজন দাস ছিল এবং আরব দেশে দাসদের কোন মর্যাদা ছিল না। এরা খুবই অত্যাচারিত ও নিপীড়িত জাতি ছিল। মালিক যেভাবে চাইত তাদের সঙ্গে সেই আচরণই করা হত। তাদের অবস্থা জন্তুদের চাইতেও নিকৃষ্ট ছিল। মহানবী (সাঃ) শুধুমাত্র যায়েদকে ভালোই বাসতেন না বরং তাঁর পুত্র উসামাকেও ভালোবাসতেন। তাদের সঙ্গে নিজ সন্তানদের ন্যায় আচরণ করতেন। এমনকি অনেক সময় তো উসামার নাকও পরিষ্কার করে দিতেন। হুজুর (সাঃ) নিজ নাতি হযরত হুসাইনকে এক উরুতে এবং উসামাকে অপর উরুতে বসিয়ে নিতেন আর তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন যে হে আল্লাহ! আমি এদেরকে ভালোবাসি তুমিও এদেরকে ভালোবাস।

(সুনান তিরমিযী, কিতাবুল মানাকেব)

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আঁহযরত (সাঃ) বলেছেন أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ অর্থাৎ নিজ সন্তানদের সম্মান কর এবং তাদের সাথে কোমলতার আচরণ কর ও তাদের সঠিক তরবিয়ত কর।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব)

মহানবী (সাঃ) যুদ্ধ ক্ষেত্রেও শিশুদেরকে আঘাত পৌঁছাতে এবং হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

## দাসদের মুক্তিদাতা

আঁহযরত (সাঃ) যখন নবী হওয়ার দাবি করেন তখন তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা এটাই ছিল যে, দাসদের সহিত যেন দয়া ও কোমলতার আচরণ করা হয়। তিনি (সাঃ) সেই যুগেই কোরআনের শিক্ষার আলোকে এই অভিযান (তাহরীক) আরম্ভ করেন যে, দাসদেরকে মুক্ত করা এক মহান পুণ্যের কাজ এই অভিযান আরব দেশের দাসদের উপর এক গভীর প্রভাব ফেলেছে। এবং তারা রহমতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে নিজেদের পরিত্রাতা বলে আখ্যায়িত করে। এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম সেইসব দাস ও দুর্বল শ্রেণির মাঝে অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে। সুতরাং পর্যায়ক্রমে ইসলামি আদেশাবলী অবতীর্ণ হওয়ার সাথে দাসদের অবস্থাও ক্রমশঃ উন্নত হতে থাকে। এই মুহাম্মদী দাসরা সর্বদা তাঁর দরবারে কোন না কোন আশা নিয়ে অপেক্ষা করত। অবশেষে জাগতিক দিক থেকে দুর্বল ও নিকৃষ্ট মানের জাতি খোদার দরবারে রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহুর মর্যাদয় ভূষিত হয়ে যায়।

আঁহযরত (সাঃ) অবৈধ ও অচ্যাচারপূর্ণ দাসত্ব প্রথার অবসান ঘটান এবং যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি (সাঃ) দাসদের অবস্থার উন্নতি ও তাদের স্বাধীনতার আহ্বান জানান এবং আদেশ জারী করেন সুতরাং আঁহযরত (সাঃ) এর শিক্ষা এবং আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানরাও সাড়া দিয়ে দাস মুক্তির অভিযানে যথাযথভাবে অংশ নিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই দাসদের মর্যাদা অন্যান্য জাতির মর্যাদার সমপর্যায়ে গণ্য করা হয়। এবং তাদের প্রাপ্ত অধিকার অন্যান্য জাতির ন্যায় তাদেরকে একই সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে একথা স্বীকার করতে হয় যে, কেয়ামত পর্যন্ত তিনি (সাঃ) দাস ও দুর্বল শ্রেণির জন্য পরম

হিতৈষী রূপে আখ্যায়িত হয়েছেন।

এই সমস্ত আদেশ উপদেশাবলী যা তিনি (সাঃ) দাসদের মুক্তি, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তাদের উৎসাহ দান, তাদের অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার, এই সমস্ত বিষয়াদি পবিত্র কোরআনের আলোকে নিজ উম্মতকে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। অতএব এই সমস্ত দিকগুলো এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বর্ণনা করা খুবই কঠিন ব্যাপার। অতএব মাত্র কয়েকটি উপস্থাপন করছি।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি দশ বৎসর হুজুর (সাঃ) এর সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। যখন আমি প্রিয় নবীর দরবারে এসেছিলাম তখন আমার বয়স খুবই কম ছিল। এবং আমার অনেক কাজ সেভাবে সম্পন্ন হয়নি যেভাবে আমার আকা হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) চাইতেন। তবুও প্রিয় নবী (সাঃ) কখনোই আমাকে আহ্ পর্যন্ত বলেননি এবং তিনি (সাঃ) আমাকে কখনো একথা বলেননি যে, তুমি অমুক কাজ কেন করেছ বা অমুক কাজ কেন কর না।

এক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে, তোমাদের দাস তোমাদের ভায়ের ন্যায়। খোদাতা'লা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে রেখেছেন। অতএব যার ভাই তার অধীনস্থ, সে নিজে যা খায় তাকেও যেন সেই খাবারই দেয়। যে পোষাক সে পরিধান করে সেই পোষাক যেন তাকেও পরিধান করায়। এবং তাকে এধরনের কোন কষ্টদায়ক কাজ যেন না দেয় যা তার সামর্থ্যের বাইরে। যদিও বা তাকে সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজ দেওয়া হয় মালিক নিজেও যেন সেই কাজে তাকে সহযোগিতা করে।

(বুখারী, কিতাবুল আতাক )

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাঃ) বলতেন যে, হে মুসলমানগণ! তোমরা নিজেদের দাস ও দাসীকে আমার দাস ও আমার দাসী বলে ডাকার পরিবর্তে আমার ছেলে ও আমার মেয়ে বলে ডাকবে। এবং দাস ও দাসীরা যেন নিজের মালিককে আমার মালিক বলে ডাকার পরিবর্তে সর্দার (সায়্যিদ) এবং সম্মানীয় ব্যক্তি বলে ডাকে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আতাক)

একদিন আবু মাসুদ (রা.) নিজের দাসকে কোন কারণে মারধর করে। এই সংবাদ পেয়ে নবী করীম (সা.) রাগান্বিত হয়ে বলেন, আবু মাসুদ! এই দাসের উপর তোমার যতটুক শক্তি আছে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খোদার তোমার উপর আছে। এই কথা শুনে আবু মাসুদ তৎক্ষণাৎ সেই দাসকে মুক্ত করে দেয়। তা দেখে নবী করীম (সা.) বলেন: যদি তুমি এমনটি না করতে , তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমার মুখমণ্ডলকে পুড়িয়ে দিত।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) বলতেন যে, যদি কোন মুসলমান ব্যক্তি কোন দাসকে মুক্ত করে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জাহান্নামের আগুন থকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি দান করবেন।

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান ও ওয়ান নুযুর)

দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রাপ্তির বিভিন্ন মাধ্যম ছাড়াও তিনি (সা.) দাজদের নিজ মালিকের সেবা করার পরেও বাকি সময়টুকু ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে (উপার্জন করে) নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ প্রদান করেছেন। এমনকি নিঃসন্তান মালিকের দাসকেও সম্মত্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেছেন। এবং চুক্তিপত্রের অধিকারও প্রদান করেছেন।

দাসদের প্রতি উত্তম আচরণ এবং উল্লেখিত উপদেশাবলী স্মরণ করাতে গিয়ে নিজের জীবনের শেষ ওসিয়্যতেও উল্লেখ করেন। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.)-এর মুখ থেকে যে শেষ কথা বের হয়, (অর্থাৎ যখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করছিলেন) এই ছিল যে, তোমরা নামায এবং দাসদের প্রতি আমার শিক্ষাগুলি ভুলে যেও না।

(ইবনে মাজা, আবওয়াবুল ওসিয়্যত)

উল্লেখিত হাদীসগুলি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবী করীম (সা.) এর শিক্ষায় শুধু মাত্র দাসদের প্রতি সদ্ব্যবহার, দয়া, অনুগ্রহ এবং তাদের স্বার্থ ও তরবিয়তের আদেশ দেওয়া হয় নি, বরং আঁ হযরত (সা.) -এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানরা যেন দাসদেরকে নিজের ভাইয়ের মত গণ্য করে। এবং প্রত্যেক বিষয়ে সে যেভাবে জীবন যাপন করে তাদেরকে সেভাবেই রাখে। যেন তার সামাজিক জীবন অন্যান্য স্বাধীন ব্যক্তিদের ন্যায় উন্নত হয়ে ওঠে। এবং তাদের অন্তরেও যেন আত্মবিশ্বাস জাগে এবং হীনমন্যতা দূরীভূত হয় এবং মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে সম অধিকারের সহিত জাতি ও দেশের জন্য কল্যাণকর সত্ত্বা হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং মালিকের অন্তর থেকে অহংকার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতএব নিঃসন্দেহে এটি সেই উচ্চমানের শিক্ষা যার উদাহরণ কোন ধর্ম ও জাতির মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে যুগে অনেক দেশ রহমাতুল্লিল আলামীনের এই অনুপম সুন্দর শিক্ষাকে দেশীয় আইন হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

হুনাইনের যুদ্ধে হোয়াজন গোত্রের কিছু লোককে বন্দী করে আনা হয়। হোয়াজন গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা.) এর নিকট এসে তাদের সেই গোত্রকে দুধ পান করানোর যুগের কথা স্মরণ করিয়ে তাদের মুক্তির জন্য আবেদন করে। এই কথা শুনে মহনবী (সা.) শুধুমাত্র নিজের ও মুতালেবের বংশধরদের অংশের বন্দীদেরকেই মুক্তি দান করলেন না, বরং সাহাবাগণের সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্ত বন্দীদেরকে মুক্তি দিলেন।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ২৩ বৎসরের অত্যাচার ও নিপীড়নের যুগের পর যখন মহানবী (সা.) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর অন্তর খোদার প্রশংসায় পরিপূর্ণ ছিল, এবং অন্তর আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি ভালবাসায় তেমনই পরিপূর্ণ ছিল যেমন ১৩ বৎসর পূর্বে ছিল যখন তাঁকে নিজের প্রিয় শহর মক্কা ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। তখন তিনি (সা.) বাহ্যিকরূপে দুর্বল ছিলেন, কিন্তু আজ তিনি মক্কার বিজয় এবং তাঁর হাতে ক্ষমতা ছিল। মক্কার কুফফার ভয়ে থরথর কাঁপছিল। কিন্তু তাদের অন্তর বলছিল যে, হে মোহাম্মদ (সা.)! তুমি তো দয়ার সাগর। সুতরাং তিনি ক্ষমা ঘোষণা দেওয়ার সময় জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর একজন সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ দাস হযরত বেলাল (রা.)কে ভুলে যান নি এবং তিনি হযরত বেলাল (রা.)-এর মাধ্যমে ঘোষণা করলেন যে, মক্কার কুরায়েশরা যদি নিরাপত্তা চায়, যারা হযরত বেলালের উপর ভয়াবহ অত্যাচার করেছিল, তবে তাদেরকে বেলারের পতাকা তলে আশ্রয় নিতে হবে। এভাবে তিনি হযরত বেলালের আবেগ অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন, এবং এইভাবে এক মধুর প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে বেলালের মন জয় করেছেন। সুবহানাল্লাহ্! কত উচ্চ তাঁর সেবকের মর্যাদা ও কতই না প্রিয় তার মান্যবর!

প্রিয় পাঠক বন্ধুগণ! দয়ার সাগর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এই সব উপদেশাবলী শুধু সেই যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধই ছিল না বরং তা কেয়ামত পর্যন্ত এক পরিপূর্ণ কর্মসূচি এবং পথ নির্দেশক রূপে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে, এমনকি শরীয়তের অংশ হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও কিছু ঈর্ষাপরায়ণ ইসলামের শত্রুরা বলে বেড়ায় যে, ইসলাম তো দাস বানানোর প্রথার প্রচলন করে গেছে।

(নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক)

প্রিয় পাঠক বন্ধুগণ! সেই যুগে যখন ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল, তখন তাদেরকে পশুর ন্যায় বেচাকেনা করা হত। আর সেই সময় দয়ার সাগর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই দুর্বল শ্রেণীর সাথেও পরম ভালোবাসা ও দয়ার আচরণ করেছেন । এবং যে বয়সে শিশুরা নিজের পিতা-মাতার স্নেহ ছায়ায় থাকতে চায়, কিন্তু হজরত যায়েদ (রাঃ) তাঁর ভালোবাসা, দয়া ও অনুগ্রহের নমুনা দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, নিজ পিতা-মাতার সঙ্গে ঘরে ফিরে যেতে অস্বীকার করেন এবং স্বাধীন জীবন অপেক্ষা তাঁর স্নেহশীল প্রভু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) এর কৃতদাস হিসেবে থাকাকে প্রাধান্য দেন। অপরদিকে তিনিও (সাঃ) তার প্রতি পরম দয়া ও করুণা বর্ষণ করে তাকে নিজের পোষ্য পুত্র করে সেই উত্তম আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন যা জগতের কোন ধর্মের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

## জীবজন্তুদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ

পশুপাখিও খোদাতা'লার সৃষ্ট জীব। আল্লাহতা'লা কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে পশুপাখিকে নিদর্শন স্বরূপ এবং তাদের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে উপদেশ গ্রহণের মাধ্যম বানিয়েছেন। এজন্যই আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআনে সূরা আনআম নামে একটি সূরার রেখেছেন। নবী করীম (সাঃ)কে তো সকলের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি (সাঃ)

পশুপাখিদের প্রতিও দয়া ও করুণার উত্তম আদর্শ স্থাপন করে অন্যদেরকেও তার উপদেশ প্রদান করেছেন।

একদা নবী করীম (সাঃ) এক আনসারী সাহাবীর বাগানে যান, যেখানে এক উট তাঁকে দেখে কাঁদতে লাগে এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। এই দেখে তিনি (সাঃ) অতি কোলমলতার সহিত তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলে সে শান্ত হয়ে যায়। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞাসা করেন যে, এই উটটি কার? এক আনসারী বলে যে, এটি আমার উট। তখন তিনি (সাঃ) বলেন এ আমার কাছে অভিযোগ করছিল যে, তুমি নাকি একে খেতে দাওনা এবং সামর্থের চাইতে বেশী কাজ নাও। খোদাতা'লা তোমাকে এর মালিক করেছেন। অতএব খোদাকে ভয় কর।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ)

হযরত সাহাল (রাঃ) হতে বর্ণিত যে হুজুর (সাঃ) এক উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ক্ষিদেতে তার পেট পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল। তাকে দেখে হুজুর (সাঃ) বললেন , এরা অবলা জন্তু, এদের পিঠে তখন বস যখন এরা সুস্থ্য-সবল থাকে এবং এদের মাংসও তখন খাও যখন এরা স্বাস্থ্যবান থাকে।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ)

হযরত আব্দুল্লা বর্ণনা করে যে, আমরা এক সফরে হুজুর (সাঃ) এর সফর সঙ্গী ছিলাম। হুজুর (সাঃ) একটি পাখির দিকে লক্ষ্য করেন যার দুটি বাচ্চা ছিল। আমরা যখন তার বাচ্চা দুটো হাতে তুলে নিই সে আমাদের চতুর্দিকে উড়তে লাগে এই দেখে হুজুর (সাঃ) বলেন যে, কে একে এর বাচ্চাদের জন্য কষ্ট দিচ্ছে ? এর বাচ্চা একে ফিরিয়ে দাও।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন যে, একদিন আমি এমন এক উটের পিঠে বসে ছিলাম যা খুবই জেদি ছিল এবং আমাকে বিরক্ত করছিল। আমিও তাকে এদিক ওদিক দৌড়াতে লাগি এই দেখে নবী করীম (সাঃ) বলেন যে, ওর সাথে কোমল ব্যবহার কর।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ)

একদিন হুজুর (সাঃ) সাহাবাগণের সঙ্গে কোন সফরে ছিলেন। রাস্তায় কোন এক জায়গায় পাখি ডিম পেড়েছিল এক ব্যক্তি সেই ডিমগুলি তুলে নেয় তখন পাখি এসে নবী করীম (সাঃ) এর মাথার উপর ব্যাকুল হয়ে উড়তে লাগে। হুজুর (সাঃ) বলেন যে, তোমাদের মধ্যে কে এর ডিমগুলি নিয়ে একে কষ্ট দিচ্ছ? যে নিয়েছিল সে বলে যে, হুজুর আমি নিয়েছি। নবী করীম (সাঃ) তাকে বল৭ক্ষ্লেন যে, এর প্রতি দয়া কর এবং ডিমগুলি সেখানে রেখে দাও যেখান থেকে তুলেছ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দীর্ঘ সফরে নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবাগণ এক এক করে সওয়ারী করতেন যেন দুর্গম ও বালুকাময় রাস্তায় বেশি বোঝার কারণে সওয়ারীর (জন্তর) হাঁটতে কষ্ট না হয়। অক্ষম উটে বেশী বোঝা চাপানো বা একসঙ্গে তিনজন সওয়ারী করতে তিনি (সাঃ) অপছন্দ করতেন। এমনকি তিনি (সাঃ) পশুর আরাম ও প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে রাস্তায় রাত অতিবাহিত করতেন। নবী করীম (সাঃ) পশুদের শরীরে কষ্টদায়ক পদ্ধতিতে চিহ্ন লাগানো অযথা কসম ও মনঃবাসনা পুরণার্থে জীবিত জন্তুর শরীর থেকে মাংস কেটে নেওয়া থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন এবং এবিষয়ে তিনি অসন্তোষ ব্যক্ত করতেন।

অনুরূপভাবে তিনি (সাঃ) আল্লাহর পথে ব্যবহার করা যুদ্ধের ঘোড়াগুলিকে খুব ভালোবাসতেন এবং এই ভালোবাসাকে নিজ সাহাবাগণের মধ্যে এত বিস্তৃত করেছেন যে, যার উদাহরণ অন্যান্য নবীগণের ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এদেরকে তিনি তো সেবক নামে আখ্যায়িত করতেন। এবং এদের স্বাস্থ্য ও খাওয়া দাওয়ার প্রতি তাকিদ করতেন। সুতরাং তিনি (সাঃ) নিজ অনুসারীদের বলেছেন

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ আল্লাহতা'লা ফয়সালা (নির্দ্ধারণ) করে দিয়েছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের জন্য ঘোড়ার ললাটে বরকত রেখে দিয়েছেন।

(বুখারী, হাদীস নম্বর-২৮৫২)

অনুরূপভাবে তিনি (সাঃ) উট এবং ছাগলের উপকারীতা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন- الإبل عز لأهلها, والغنم بركة অর্থাৎ উট নিজের মালিকদের জন্য সম্মান জনক এক প্রাণী এবং ছাগল নিজ মালিকদের জন্য বরকতের কারণ।

এক হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে, "মোরগকে তোমরা কেউ গালি দিওনা কেননা সে তোমাদেরকে নামাযের জন্য জাগায়।"

(আবু দাউদ, বাব মা জাআ ফিদ্দীক)

এক পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে এক ব্যাভিচারিনী জান্নাতের অংশীদার হয়ে যায়। এবং এক বিড়ালকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখার জন্য এক মহিলার জাহান্নামী হওয়ার ঘটনা শুনিয়ে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজ উম্মতকে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, পশু-পাখির প্রতি উত্তম আচরণ এবং তাদের ক্ষুধা নিবারণে আল্লাহতা'লা কত বড় পুণ্য রেখেছেন।

অজ্ঞতার যুগে পশুশের সাথে অতি নিকৃষ্ট আচরণ করা হত। রীতিনীতির নামে তাদেরকে অযথা বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দেওয়া হত। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজ উম্মতকে পশুদের উপর সকল প্রকারের কুপ্রথা বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন এবং তাদেরকে কষ্ট দিতে নিষেধ করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাঃ) تحريش بين البهائم অর্থাৎ জন্তুদের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়া্ইয়ের প্রতিযোগিতা করতে নিষেধ করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে 'মুসলা' করে (নাক, কান ইত্যাদি কেটে ফেলে) তার উপরে আল্লাহতা'লার (লানত) অভিশাপ পড়বে। এমনকি তিনি (সাঃ) নিশানাবাজী ও আমোদ প্রমোদের জন্য জীবিত পশুদের ব্যবহার করা আল্লাহতা'লাকে অসন্তুষ্ট করার কাজ বলেছেন।

নবী করীম (সাঃ) ক্ষতিকর জন্তুকে মারার আদেশ দিয়েছেন ঠিকই , যেমন- সাপ,বিছা ইত্যাদি; কিন্তু সেগুলিকেও দয়ামায়ার পদ্ধতি অবলম্বন করে মারার আদেশ দিয়েছেন। তাদেরকে নির্দয়ভাবে মারতে নিষেধ করেছেন এবং জন্তুদের আগুনে পুড়িয়ে মারতেও নিষেধ করেছেন।

নবী করীম (সাঃ) জবাই করার সময় পশুপাখির প্রতি উত্তম আচরণের আদেশ দিয়েছেন। তিনি (সাঃ) বলেন যে, যখন তোমরা কোন পশুকে জবাই কর তখন উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করে জবাই কর। ধারালো অস্ত্র ব্যবহার কর এবং পশুকে কষ্ট দিও না।

(তিরমিযী, বাবুন নিহা আনিল মিসলিহ)

মোটকথা প্রিয় নবী রহমাতুল্লিল আলামিনের দয়া ও করুণার আদর্শ শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তাঁর দয়ার সীমা পশুপাখির মাঝেও বিস্তৃত ছিল। তাদের অধিকার প্রদানের জন্য সব সময় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেন এবং তাদেরকে নিজ দয়া ও করুণার ছায়াতলে আশ্রয় প্রদান করেছেন।

হযরত মীর মহম্মদ ইসহাক সাহেব তাঁর উর্দু কবিতায় বলেছেন-

অনুবাদ: হে মুহাম্মদ (সাঃ) ! তুমি তোমার ভালোবাসায় বিদ্ধ করেছ এবং অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে শত্রুদেরকে নিজ অনুরাগীতে পরিণত করেছ। অজ্ঞতাকে তুমি নিশ্চিহ্ন করেছ এবং শরীয়তকে তুমি পরিপূর্ণতা দান করেছ। তুমি হালাল ও হারামকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছ । অতএব হে প্রিয় নবী তোমার উপর শত শত দরূদ ও সালাম।

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর এই উক্তির মাধ্যমে এই প্রবন্ধটি শেষ করছি। যেখানে তিনি (আঃ) বলেন-

" আমি সর্বদা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি যে,এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ' (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও

এরপর ১৫-এর পাতায়.......

জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যকে ২০১৭ সালের কাদিয়ান জলসা সালানার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

**দোয়াপ্রার্থী:**

**আব্দুর রহমান খান, জামাত আহমদীয়া আইমা, দঃ ২৪ পরগনা।**

# মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কুরআন করীমের শিক্ষা

মূল: লাঈক আহমদ ডার, মোবাল্লেগ সিলসিলা অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলম, মোবাল্লেগ সিলসিলা

পূর্ণ মানব সৃষ্টির সঙ্গেই মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের বৃত্তটিও পূর্ণতা লাভ করে। সেই পূর্ণ মানব কুরআনে করীমের শিক্ষার আলোকে মানবতার মর্যাদার জন্য এমন রেখামান নির্ধারণ করে দিয়েছেন যা একজন ন্যায়পরায়ণ পাঠককে বিস্ময়াভিভূত করে তোলে। কুরআনী শিক্ষার পূর্ণ অনুসরণে মহানবী (সা.) জীবনের প্রত্যেকটি মূহুর্ত শরীয়ত-বিধানের গণ্ডিতে থেকে মানবীয় মূল্যবোধ শেখানোর কাজে ব্যপৃত থেকেছেন। যদি মানবজাতি, বিশেষ করে মুসলমান জাতি মানবতার এই ধ্বজাবাহক মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে কিছু শিখত তবে পৃথিবী আজ অমর ও অক্ষয় শান্তি-নিবাস হত। কুরআন করীমের শিক্ষার আলোকে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষ হিসেবে সকলে সমান এবং সকলের অধিকার সমান। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই বিদায়ী হজ্জের সময় নিজ অনুসারীদেরকে মানবতার মহান বাণী প্রদান করে বলেন: সর্বদা স্মরণ রেখো! কোন আরব কোন অনারবদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না আর না কোন অনারব কোন আরবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, কোন শ্বেতাঙ্গ কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না অনুরূপভাবে কোন কৃষ্ণাঙ্গ কোন শ্বেতাঙ্গের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। অতএব ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা হল সমস্ত জাতি ও বর্ণের মানুষ সমান। তিনি এ শিক্ষাও দিয়েছেন যে, কোন বৈষম্য ও বিভেদ ছাড়াই প্রত্যেকের সমান অধিকার প্রাপ্য। এই মৌলিক নীতিই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক শান্তি ও সমন্বয়ের ভিত রচনা করে।

আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় হল, এখন মানবজাতির জন্য নির্ধারিত এই অটল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনবিধি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অনন্য নজির হয়ে থাকবে। আর এর জ্যোতিঃ ও ঔজ্জ্বল্য সকলের পথ-প্রদর্শনের কারণ হবে। আলহামদোলিল্লাহ॥

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, কুরআন মজীদের মত এক পরিপূর্ণ শরীয়ত গ্রন্থের অবতরণ হয়েছে মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে পূর্ণতা দানের জন্য আর এখন এই বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানবজাতি সকল (আধ্যাত্মিক) ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করবে, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক এবং অকৃত্রিম ভালবাসা তৈরী হতে পারে আর মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক প্রেম-বন্ধনও সুদৃঢ় হতে পারে। আমরা মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা মহানবী (সা.)-কে আদর্শ স্থাপন করতে দেখি। মহানবী (সা.) এক দিকে যেমন পরিপূর্ণ বান্দেগীর মর্যাদা অর্জনের ক্ষেত্রে সফল হন, তেমনি তাঁর সত্তায় মানবীয় গুণাবলীর সকল পরাকাষ্ঠা পূর্ণতা পেয়েছে। এই সকল উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী এবং প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার সুবাদে তিনি পূর্ণ মানব রূপে অভিহিত হয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"এই কারণেই কুরআন শরীফ পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম গ্রন্থের তুলনায় পূর্ণাঙ্গীন ও সমগ্র হওয়ার দাবী করে। কারণ, ভূ-পৃষ্ঠে অন্য কোন ধর্ম পুস্তকই এই ত্রিবিধ সংস্কার সাধনের সুযোগ পায় নি। কেবল কুরআন শরীফেরই এই সুযোগ ঘটেছিল। কুরআন শরীফের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পশুর স্তর থেকে মানুষের স্তরে উন্নীত করা, মানুষকে নৈতিক মানুষে উন্নীত করা এবং নৈতিক মানুষকে খোদা-প্রাপ্ত মানুষে পরিণত করা।"

(ইসলামী নীতি-দর্শন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১০ পৃষ্ঠা: ৩২৯)

মানবীয় মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষা

কুরআন মজীদ একাধিক মৌলিক নীতি বর্ণনা করেছে। কয়েকটি নীতি ও শিক্ষা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানব জাতির (কল্যাণের জন্য উত্থিত করা হইয়াছে; তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক, এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখ।

(আলে ইমরান: ১১১)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন: মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হল, নিজেদের কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে তাদেরকে জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মুসলমানরা যদি এই প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করত তবে তারা এভাবে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হত না।

(তফসীরে সাগীর, পৃষ্ঠা: ৯৪, সূরা আলে ইমরান, টীকা: আয়াত নম্বর-১১০)

অর্থাৎ মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হল মানবজাতির সম্মান প্রতিষ্ঠিত করা এবং সার্বজনীন কল্যাণের বিস্তার করা। কিন্তু বর্তমানে এই বিষয়টি তাদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন যুগে অন্যান্য যে জাতিসমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে তাদেরও সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতিকে অন্ধকারের গহ্বর থেকে উদ্ধার করে সম্মান ও মর্যদার আসনে অধিষ্ঠিত করা। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আজ তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের অনুবর্তিতায় জামাত আহমদীয়া এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার লক্ষ্যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। আলহামদোলিল্লাহ।

(২) মানবীয় সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে এই মূল্যবান নীতি বর্ণনা করেছেন:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

কেহ কোন ব্যক্তিকে- কোন ব্যক্তির (হত্যার) বদলা ব্যতিরেকে অথবা দেশে কলহ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ব্যতিরেকে-হত্যা করিলে, সে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে হত্যা করিল; যে কেহ একটি জীবনকে বাঁচাইল সে যেন সমগ্র মানব মণ্ডলীকে বাঁচাইল।

(আল মায়েদা: ৩৩)

শান্তি স্থাপনকারী এই স্পষ্ট নীতিই একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠন করতে পারে। এখানে অন্যায় ভাবে মানুষকে হত্যা করা থেকে বাধা দান করে মানবজাতিকে বিকাশ লাভের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না, এবং উহাকে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিও না যাহাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জানিয়া শুনিয়া অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিতে পার।

(আল-বাকারা: ১৮৯)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: "কুরআন করীম অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজবদ্ধ জীবনের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ বা নিজের দেশের বা জাতির সম্পদকে নিজের বলে অভিহিত করে। এটি এদিকে ইঙ্গিত করে যে, যে ব্যক্তি স্বজাতির কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করে, বস্তুতঃ সে নিজেরই ক্ষতি করে। এখানেও নিজের সম্পদ বলতে সমগ্র মানবজাতির সম্পদের কথা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু, উপরোক্ত নীতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সেগুলিকে নিজের সম্পদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই সূরার ১০ নং রুকূতে বর্ণনা করা হয়েছে-

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ

অতঃপর আগে বর্ণনা করা হয়েছে-

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ

যার থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, 'আনফুসাকুম' এবং

‘দিমাআকুম’ দ্বারা নিজেদের ভাইদের প্রাণ ও রক্তকে বোঝানো হয়েছে।”

(তফসীর সাগীর, পৃষ্ঠা: ৪১, টীকা, নোট নং-২, সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৯)

(৪) অতঃপর সমাজে শান্তি স্থাপনের আরেকটি অনুপম সুন্দর শিক্ষা হল-

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাহাদের সহিত এমন পন্থায় বিতর্ক কর যাহা সর্বাধিক উত্তম।

(সূরা নাহল: ১২৬)

কতই না সুন্দর শিক্ষা! মানবতার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে মানবাধিকার রক্ষা করে অভিব্যক্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত রচনার পথকে সুগম করেছে এবং এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে তবলীগের আদেশ দেওয়া হচ্ছে। এমন অনুপম সুন্দর শিক্ষা সত্বেও মুষ্টিমেয় মুসলিম সংগঠন জিহাদের নামে নিরীহ ও নিষ্পাপ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে আর তাদের এই জঘন্য অপরাধকে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করছে।

(5)وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ-فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ

তাহার (এই রসূলের) এই উক্তির কসম, যখন সে বলিয়াছিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! ইহারা এমন এক জাতি, যাহারা ঈমান আনিতেছে না’। (আমরা উত্তরে বলিলাম) সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং বল, ‘সালাম’; অতএব অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে। (সূরা আযযুখরুফ: ৮৯-৯০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

“ এই কথাগুলির দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমন এক শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন যা সমগ্র মানবজাতির জন্য কৃপা ও অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম এবং মানবতার জন্য শান্তির কারণ। এই আয়াতে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) -এর শান্তির এই বার্তার প্রত্যুত্তরে তাঁর বাণীকে কেবল প্রত্যাখ্যান করাই হয় নি, তারা তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা - বিদ্রূপ করেছে। আর এখানেই শেষ নয়, পরবর্তীতে তারা প্রবল শত্রুতার পথ অবলম্বন করে এবং কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে। এতদ্সত্বেও তিনি এই দোয়াই করেছেন যে, ‘আমি এদের হিতৈষী, কিন্তু এরা আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। এরা আমাকে কষ্ট দেওয়ার কোন সুযোগ হাত ছাড়া করে না।

এর উত্তরে আল্লাহ্ তা’লা তাঁকে এই কথা বলে সান্তনা দান করেছেন যে, যা কিছু এরা করছে তা তুমি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ত্যাগ কর। তোমার একমাত্র কাজ হল পৃথিবীতে শান্তির বিকাশ ঘটানো এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকা। :

(বিশ্ব-সংকট ও শান্তির পথ, পৃষ্ঠা: ১২৬-১২৭)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

এবং অবশ্যই আমরা আদম সন্তানদিগকে সম্মানিত করিয়াছি এবং আমরা তাহাদিগকে স্থলে ও সমুদ্রে আরোহণ করাইয়াছি এবং তাহাদিগকে পবিত্র রিযক দান করিয়াছি এবং আমরা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্য হইতে অনেকের উপর তাহাদিগকে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি।

(বানী ইসরাঈল: ৭১)

(7)وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশতাগণকে বলিয়াছিলাম, ‘তোমরা আদমের আনুগত্য কর’; তখন তাহারা আনুগত্য করিল। কেবল ইবলিস ব্যতিরেকে, সে অমান্য করিল এবং নিজেকে অনেক বড় মনে করিল; বস্তুত সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। (আল-বাকারা: ৩৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আদম বলতে পূর্ণ মানবকে বোঝানো হয়েছে। মানুষ যখন পূর্ণ মানব বা আদমে পরিণত হয় তখন আল্লাহ্ তা’লা ফিরিশতাদেরকে সিজদা (আনুগত্য) করার আদেশ দেন আর তার প্রত্যেকটি কাজ ফিরিশতাদের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন; কিন্তু আদমের পূর্ণ মানব হওয়ার জন্য মানুষকে খোদার সঙ্গে সত্যিকার প্রেম এবং অটুট সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কাজ হোক বা বিশ্রাম মানুষ ঐশী ইচ্ছার অধীনে হয়ে তার যাবতীয় কাজ করলে সে খোদার হয়ে যায়। তখন খোদা মানুষের বন্ধু ও উত্তরাধিকার হয়ে যায়, কেউ তাকে বিরোধীতা করে বিরত করতে পারে না।কিন্তু যে ব্যক্তি ঐশী আদেশাবলীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, খোদাও তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। ..... আদম (আ.) পূর্ণ মানব ছিলেন, যার কারণে ফিরিশতাদেরকে সিজদা (আনুগত্য) করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে আমাদের মধ্যে যদি প্রত্যেকে পূর্ণ মানবে পরিণত হয়, তবে তারাও ফিরশিতাদের সিজদার অধিকারী। ”

(আল-হাকাম, ৯ম খণ্ড, নং-৫, ১০ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫, পৃষ্ঠা: ৪)

(8)اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً

তোমরা কি দেখ না যে যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলকেই আল্লাহ্ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করিয়াছেন?

(সূরা লুকমান: ২১)

(9)لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

নিশ্চয় আমরা মানুষকে সর্বোত্তম উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছি।

(আততীন: ৪)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: খোদার অভিপ্রায় হল, মানুষ যেন খোদার গুণাবলী অবলম্বন করে। যেরূপে তিনি সকল পাপ ও মন্দ থেকে পবিত্র, মানুষও যেন অনুরূপ পবিত্রতা অর্জন করে। যেমন-তাঁর মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য এবং জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, মানুষের মধ্যেও যেন অনুরূপ বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়। এই কারণে ‘খালক’ বা সৃষ্টিকে সর্বোত্তম উপাদান বলেছেন-

(9)لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

যে মানুষ ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যাবলী ধারণ করে তারা এই আয়াতের সত্যায়ন স্থল আর যারা কুফর করে তাদের স্থান হল ‘আসফালাস সাফেলীন’।

(আল-বদর, ২য় খণ্ড, ৬ই মার্চ, ১৯০৩)

অনুরূপভাবে তিনি বলেন: মানুষকে আমরা সাম্যের উপর সৃষ্টি করেছি আর এই সাম্যের বৈশিষ্ট্যে সে সকল সৃষ্টির সেরা।”

(তওযিহ মরাম, পৃষ্ঠা: ৪৭)

(10)وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ

এবং তিনি তোমাদের সেবায় সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়োজিত করিয়াছেন, উভয়েই অবিরাম কর্তব্যরত আছে। এবং তিনিই তোমাদের সেবায় রাত্রি এবং দিনকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

(সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৩৪)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: “ একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ফিরিশতাদের বৈশিষ্টাবলীর মর্যাদা মানবীয় বৈশিষ্টাবলীর মর্যাদা থেকে খুব বেশি নয়, এমনকি মানবীয় বৈশিষ্টাবলী ফিরিশতাদের বৈশিষ্টাবলীদের থেকে শ্রেষ্ঠতর। আর ইহজাগতিক বা আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করে না, বরং কুরআন শরীফের নির্দেশের দৃষ্টি কোণ থেকে তাদেরকে সেবক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। যেরূপ আল্লাহ্ তা’লা বলেন- وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ অর্থাৎ তিনিই সেই খোদা যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। যেমন দেখা উচিত যে- একজন পত্রবাহক বাদশাহর পক্ষ থেকে তার কোন দেশ, রাজ্য বা গভর্নরের কাছে চিঠি পৌঁছে দেয়- তবে কি এর দ্বারা এটি প্রমাণ হয় যে, সেই পত্রবাহক, যে কি না বাদশাহ ও গভর্নর জেনারেলের মধ্যে যোজকের ভুমিকা পালন করে, গভর্নর জেনারেলের থেকে শ্রেয়। অতএব, ভালভাবে স্মরণ রেখ! এই উদাহরণই সেই সমস্ত যোজকদের জন্য প্রযোজ্য যারা ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনায় সর্বশক্তিমান খোদার পরিকল্পনাসমূহকে পৃথিবীতে পৌঁছে দেয় এবং সেগুলি বাস্তবায়িত করার কাজে ব্যস্ত থাকে। মহাসম্মানিত আল্লাহ্ তা’লা কুরআন শরীফের একাধিক স্থানে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা

# ইসলাম পারস্পরিক ভেদাভেদ ও বৈষম্যকে বিদুরীত করে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বকে সুরক্ষা করে

কোন মানুষ কেবল গোটা মানবজাতিকে এভাবেই কল্যাণ বিতরণ করতে সক্ষম যখন সে বিনাব্যতিক্রমে সব মানবসন্তানকে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের মঞ্চে এনে দাঁড় করায় এবং তাদের মাঝ কোন ভোদাভেদ ও বৈষম্যকে বৈধ জ্ঞান করে না। অর্থাৎ ঐ সব বিষয়াদি যা মানুষের মান-সম্মান প্রতিষ্ঠাকারী সদসমুদয় উম্মতে মুসলেমার শরীয়তের বিধিবিধান কুরআন করীমে তথা নবী করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ বা হাদীসসমূহে পরিদৃষ্ট হয়। ইসলাম মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক ভেদাভেদ ও বৈষম্যকে বিদুরীত করে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বকে সুরক্ষা করে। এভাবেই মানুষের উন্নত মান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলাম।

নবী আকরাম (সা.) বিদায় হজ্জে যে ভাষন দান করেছেন তাতে তিনি (সা.) একথাও বলেছেন যে, 'আলা'! সাবধান হয়ে যাও আর মনোযোগ দিয়ে শুন! তোমাদের রব এক, তিনি সত্ত্বয় এক, যাঁর রবুবীয়্যতের কল্যাণে নানান জাতি বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থানরত থেকেও এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে এখন সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক যোগ্যতা ও সামর্থ্য আর তাদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীও একই রকম, এজন্য এখন তারা সর্বশেষ শরীয়তের বিধিবিধান গ্রহণের উপযোগী হয়ে উঠেছে। তোমাদের স্রষ্টা এক। তিনি তোমাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতা ও সামর্থ্য ও চাহিদাকে পরস্পরের অনুরূপ করে সৃষ্টি করেছেন। জাতিতে জাতিতে তিনি বৈষম্য-ভেদাভেদ করেন নি। এটি ঠিক যে, প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতির নিজস্ব সীমা রয়েছে, তবে জাতিগত শ্রেণীভেদ করা যেতে পারে না। এটা হতে পারে না যে, একটি জাতি নীচ, ঘৃণিত হাস্যস্পদ কিম্বা তাদের সৃষ্টিটাই এমন যে, তারা দৈহিক বা আধ্যাত্মিক অথবা বুদ্ধিমত্তায় বা নৈতিকতায় অথবা সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নতি করতে সক্ষম নয়।

অতএব, তিনি (সা.) বলছেন, সাবধান হয়ে যাও, মনোযোগ দিয়ে শুনো, তোমাদের রব যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতাকে সৃষ্টি করেছেন, সামথ্য দান করেছেন, যিনি তোমাদের যোগ্য করে তুলেছেন, যিনি তোমাদের চেতনা ও বোধশক্তি দান করেছেন, পরবর্তীতে সে সবের পরিপোষণ করে বিভিন্ন স্তরে ক্রমোন্নতির পথ পরিক্রমণ করিয়েছেন আর তোমাদের প্রতিপালন করে শীর্ষ অবস্থানে নিয়ে গেছেন-পবিত্র সত্ত্বা তিনি, নিরঙ্কুশ এক। আর তোমরা এটাও স্মরণ রেখো যে, তোমাদের আদি পিতাও একজনই। অথাৎ তোমরা সবই একই বংশগতিধারা থেকে উদগত, বিশেষভাবে তোমাদের সৃষ্টিকারী হলেন তোমাদের রব্ব আর তোমাদের আদি পিতা আদমও হলেন এক-ই। যদি তোমরা বিভিন্ন পুরুষদের বংশধর হতে তবে বলতে, 'আমরা আমাদের আমাদের পূর্ব পুরুষগণ থেকে উত্তরাধিকার লাভ করেছি আর আমাদের পূর্ব পুরুষগণ বেশি ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন সেই উত্তারাধিকারে আজ স্বভাবতঃই আমাদের এই উন্নততর মর্যাদা লাভ হয়েছে।' কিন্তু এরূপ বলা বিধিসম্মত নয় কেননা পূর্ব পুরুষ একই। পুনরায় যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, রব্ব পৃথক পৃথক হয় তবে কোন জাতি বলে বসতে পারে যে, আমাদের সৃষ্টি করেছেন যে রব্ব তিনি বেশি ক্ষমতাবান, বেশী জ্ঞানী আর বেশি শক্তিধরও, তিনি স্নেহপরায়ণও বেশি আর বেশী অনুকম্পাকারীও আর তাই তিনি আমাদের সব কিছুই অধিক মাত্রায় দান করেছেন। অন্যদের সৃষ্টিকর্তা রব্ব, জ্ঞানে সমৃদ্ধশালী নয় তার শক্তি ও ক্ষমতাও বেশি নয়, তার মাঝে অনুকম্পা বেশি নেই, তার নিজের সৃষ্টির সাথে তেমন ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক নেই যা আমাদের রব্ব আমাদের সাথে রাখেন। এ কারণে তাদের অর্জন মাত্রায় স্বল্প, তাই তুলনা মুলকভাবে তারা ঘাটতিতে রয়েছে।

কিন্তু তোমাদের রব্ব যখন এক, পূর্ব পুরুষও এক, তাহলে তোমাদের জানা উচিত যে, কোন 'আরবীয়'-এর 'অনারব'-এর উপর কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব নেই আবার কোন অনারবেরও আরবীয়-এর উপর কোনরকম প্রধান্য নেই। না কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের চেয়ে কোন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে আবার না কোন কৃষ্ণাঙ্গের শ্বেতাঙ্গের উপর প্রধান্য রয়েছে। তোমাদের রব্বের দৃষ্টিতে তোমাদের মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার ফল। তোমাদের অভ্যন্তরে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা একটাই, আর তা হল তাক্ওয়া (খোদভীতি)। খোদা তা'লার দৃষ্টিতে বেশি ধার্মিক সে-ই যে বেশী মুত্তাকী।

-হযররত মির্যা নাসের আহমদ (রহ.)

(উদ্ধৃতি-পাক্ষিক আহমদী, ১৫ ডিসেম্বর, ২০১০)

মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান.........

করেছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে তা সমস্ত কিছুই মানুষের কল্যাণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। অর্থাৎ তারা মানব কল্যাণের জন্যই সৃষ্ট। মানুষ তার মর্যাদায় সর্বোচ্চ আর সকল সৃষ্টিই তার সেবক যার সেবায় এই সব কিছু নিযুক্ত করা হয়েছে।"

(তওযীহ মরাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৪)

(11) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনিতে পারে; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্ববিদিত। (আল-হুজরাত: ১৪)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: অর্থাৎ জাতি ও বংশ পরিচয় কেবল পার্থক্য নিরুপনের জন্য। যারা এটি নিয়ে গর্ব ও অহংকার করে তারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে।

(তফসীর সাগীর, টীকা-সূরা হুজরাত, আয়াত: ১৪)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ অর্থাৎ এর অর্থ হল তোমাদের মধ্যে খোদার নিকট সব থেকে সম্মানীয় ব্যক্তি সেই যে সর্বাধিক নিষ্ঠা সহকারে তাকওয়াপূর্ণ হৃদয় নিয়ে খোদার সমীপে নতজানু হয় এবং যার মধ্যে সর্বক্ষণ প্রত্যেকটি কাজ, কথা, ওঠা বসা, প্রত্যেকটি আচরণও অভ্যাস এবং আবেগ অনুভুতি প্রকাশ করার সময় খোদা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে। সেই ব্যক্তিই সমগ্র জাতি ও বংশের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী এবং সমগ্র গোষ্ঠী থেকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গোষ্ঠীর এবং সে এই সম্মানের যোগ্য যে, সকলে তার পথে উৎসর্গিত হবে। মোটকথা ইসলামী শরীয়তের এটি একটি সাধারণ নিয়ম যে, সমস্ত কিছু তাকওয়ার উপরই নির্ভর করে।"

(তিরইয়াকুল কুলুব, পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৭)

কুরআন মজীদ অবতরণ এবং ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে মানবীয় মর্যদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রকৃত অর্থে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, তবে আজ মানুষ কেন এমন অধঃপতিত হল এবং মানবীয় মূল্যবোধ কেন এমনভাবে পদদলিত হচ্ছে? এর কারণ হল কুরআন মজীদকে একটি পরিত্যক্ত বস্তর ন্যায় ত্যাগ করা হয়েছে এবং তার সারবস্তকে উপেক্ষা করে কেবল খোসাকেই আসল মনে করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান জাতির উপর কৃপাদৃষ্টি দিন যেন তারা কুরআন করীমের শিক্ষামালাকে নিজেদের জীবনে বাস্তাবায়িত করে যা পুরোটাই মানব মযার্দাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে; যাতে সর্বত্র মানব মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানুষের সত্যতা প্রমাণিত হয়। আমীন।

জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যকে ২০১৭ সালের কাদিয়ান জলসা সালানার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

**দোয়াপ্রার্থী:**

**মজলিস আনসারুল্লাহ্ ও লাজনা ইমাউল্লাহ্ , কবিরা, দ: ২৪ পরগনা।**

# সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং সদয় আচরণ

**হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) প্রদত্ত খুতবা ঈদুল ফিতর, ৮ই জানুয়ারী, ২০০০, টিলফোর্ড লন্ডন (সারাংশ)**

তাশাহুদ, তাঊয এবং সুরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (রহ.) নিম্নোক্ত আয়াত তিলায়াত করেন।

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝ (الدهر:٩-١٠)

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছি যেগুলি দ্বারা দুর্বলদের প্রতি সহানুভুতি এবং তাদের অভাব মোচনের বিষয়ে আলোকপাত হয় আর আঁ হযরত (সা.) -এর বাণীর বরকত অনেক বেশি। এই বাণীর বরকত অন্তরে অসাধারণ প্রভাব ফেলে।

মুসলিম কিতাবুল বির-এ উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন যে, যে নিজের ভাইয়ের চাহিদা পূরণ করে আল্লাহ্ তা'লা তার চাহিদা পূরণ করে দেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলা)

অতএব নিজের চাহিদা পূরণের সর্বোত্তম উপায় হল খোদা তা'লার বান্দাদের চাহিদা পূরণে মগ্ন থাকা। যখন কোন বান্দা মানবতার সেবা করে সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা তার চাহিদা পূরণ করে থাকেন।

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের ইহজাগতিক দুঃশ্চিন্তা ও অস্থিরতা দূর করে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামতের দিনে তার দুঃশ্চিন্তা ও কষ্ট দূর করে দিবেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুয যিকর)

এই হাদীসে মুসলমান শব্দ ব্যবহৃত হয় নি, কিন্তু ইসলামের সর্বজনীন শিক্ষা হল যেখানেই দুঃখ কষ্ট দেখা দেয় তা দূর করার চেষ্টা করা উচিত এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের দুঃখ কষ্ট লাঘবকারীদের কষ্ট দূর করে দেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা ততক্ষণ পর্যন্ত না কোন বান্দাকে সাহায্য করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজ ভাইকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়। (মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল)

আরও একটি হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামতের দিন বলবেন- আমি অভুক্ত ছিলাম, তুমি আমাকে আহার করাও নি। আমি পিপাসার্ত ছিলাম তুমি আমাকে পানি পান করাও নি। আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমার শুশ্রুষা কর নি। যাদেরকে এই প্রশ্ন করা হবে তারা আল্লাহ্ তা'লাকে বলবেন হে খোদা! তুমি হবে অভুক্ত ছিলে যে আমরা তোমাকে আহার করাই নি? তুমি কবে পিপাসার্ত ছিলে যে আমরা তোমাকে পানি দিই নি? আর কবে তুমি অসুস্থ ছিলে যে আমরা তোমার সেবা করি নি? তখন আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, আমার অমুক বান্দার এই সব জিনিসের প্রয়োজন ছিল কিন্তু তোমরা তার প্রতি কোন সহানুভুতি দেখাও নি। তার প্রতি সহানুভুতিশীল হওয়া আমার প্রতি সহানুভুতিশীল হওয়ার ন্যায় ছিল। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা"লা আরও একটি জামাতকে বলবেন যে, সাবাস! তুমি আমার প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করেছ, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে অন্ন দিয়েছ, আমি পিপাসার্ত ছিলাম তুমি আমাকে পানি পান করিয়েছ ইত্যাদি। তখন সে বলবে যে, হে প্রভু! আমরা কখন তোমার প্রতি এরূপ আচরণ করেছি? তখন আল্লাহ্ তা'লা উত্তরে বলবেন যে, আমার অমুক বান্দার সাথে তোমরা সহানুভুতি প্রদর্শন করেছ যা কি না আমার প্রতিই সহানুভুতি ছিল।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ)

এটি অত্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ বাণী। আল্লাহ্ তা'লাকে আহার করানো, পানি পান করানো বান্দার জন্য সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বান্দার চাহিদা পূরণ করা এবং তার সেবার জন্য তৎপর থাকা প্রভু প্রতিপালকের সেবার নামান্তর।

আরও একটি হাদীসে হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন- তিনটি এমন বৈশিষ্ট্য বা গুণ রয়েছে যে ব্যক্তির মধ্যে সেগুলি রয়েছে আল্লাহ্ ত'লা তাকে নিজ রহমতের চাদরে আবৃত করেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান। প্রথমটি হল দুর্বলদের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া, দ্বিতীয়টি হল পিতামাতার সঙ্গে ভালবাসাপূর্ণ ও সদয় আচরণ করা এবং তৃতীয়টি হল ভৃত্য ও সেবকদের সঙ্গে সদয় আচরণ করা। (সুনান তিরমিযী)

হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.) কে একথা বলতে শুনেছি যে, আমাকে দুর্বলদের মধ্যে সন্ধান কর, তোমরা নিশ্চয় তোমাদের দুর্বল এবং দরিদ্রদের কারণে এই রিযক লাভ কর এবং সাহায্য প্রাপ্ত হও। (তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ)

এটি এমন একটি দিক যা মানুষ সাধারণত উপেক্ষা করে চলে। এই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষেরাই ধনীদের রিযকের মাধ্যম হয়ে থাকে। সকল দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করুন- যতক্ষণ পর্যন্ত না দরিদ্ররা খিদমত না করে, ধনীরা উপার্জনের কোন সুযোগ পেতে পারে না। অতএব দরিদ্রদের পরিশ্রম অর্জিত উর্পাজন ধনীরা ভক্ষণ করে থাকে অথচ তারা ভুলে যায়। আর যখন দরিদ্রদের কোন অভাব দেখা দেয় তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। এটি ঘোর অন্যায়। অতএব, নিজ পরিসরে গরীব-দুখীদের সেবা কর, কেননা তাদের কারণেই তোমাদের অন্ন জুটে।

একটি হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- " সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার।" আল্লাহ্ তা'লার তো কোন সন্তান নেই, কিন্তু সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার। এটি একটি অত্যন্ত সুন্দর বাক্য এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, যেভাবে আপনারা নিজেদের সন্তানকে ভালবাসেন, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লাও আপনাদেরকে ভালবাসেন। "অতএব আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির মধ্যে সব থেকে প্রিয় সেই যে তাঁর পরিবারের সঙ্গে সদয় আচরণ করে। "

(মসনদ আশশাশি, ১ম ভাগ, পৃষ্ঠা: ৪১৯)

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম পরিবার হল সেটি যেখানে কোন এতীম থাকলে তার উপর অনুগ্রহ করা হয়। আর মুসলমানদের মধ্যে নিকৃষ্টতম পরিবার হল সেটি যেখানে কোন এতীম থাকলে তার সঙ্গে দুর্বব্যবহার করা হয়।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব, হক্কুল ইয়াতীম)

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে নিজের অন্তরের অনমনীয়তা সম্পর্কে অভিযোগ করেন। তিনি (সা.) বলেন- যদি তুমি চাও যে, তোমার অন্তর কোমল হোক, তবে মিসকীনদেরকে অন্ন দান কর এবং কোন এতীমের অভিভাবক হও।

(মসনাদ আহমদ বিন হাম্বিল)

অতএব অপরের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শনকারীর অন্তর নিজে থেকেই কোমল হয়ে যায়। সে নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায়। তার অভাব তার মনে প্রভাব ফেলে। অতএব গরীব-দুখীদের সেবার মাধ্যমে মানুষের নিজেরই সেবা হয়ে থাকে এবং তার মনের যাবতীয় প্রকারের কঠিনতা আল্লাহ্ তা'লা দূর করে দেন।

এরপর ৩৮-এর পাতায়.....

**জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যকে ২০১৭ সালের কাদিয়ান জলসা সালানার প্রীতি ও শুভেচ্ছা**

দোয়াপ্রার্থী:

**আযকারুল ইসলাম, জামাতে আহমদীয়া আমাইপুর,বীরভুম।**

৪-এর পাতার পর...

বলবেন, আমার অমুক অমুক বান্দা এই অবস্থায় ছিল আর তোমরা তাদের প্রতি কোন সহানুভুতি দেখাও নি। পক্ষান্তরে এই আচরণ আমার সঙ্গেই করা হয়েছে।

মোটকথা মানবজাতির উপর সদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ অনেক বড় ইবাদত আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে এই প্রেক্ষিতে বড়ই দুর্বলতা প্রদর্শন করা হয়। অপরকে হেয় জ্ঞান করা হয়, তাদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়। তাদের খোঁজ খবর নেওয়া এবং কোন বিপদাপদে সাহায্য করা অনেক বড় বিষয়। যারা দরিদ্র মানুষের প্রতি সদাচারী নয় বরং তাদেরকে হেয় জ্ঞান করে, আমি তাদের নিজেরই এই বিপদের সম্মুখীন হওয়া নিয়ে আশঙ্কিত। আল্লাহ্ তা'লা যাদের উপর কৃপা করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তারা যেন তাঁর সৃষ্টির প্রতি হিতৈষী হয় এবং সেই খোদা প্রদত্ত কৃপা নিয়ে গর্বিত না হয় আর পশুদের মত দরিদ্রদেরকে পদদলিত না করে।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩৮)

১০-এর পাতার পর.....

আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোস যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই তওহীদ যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এজন্যই খোদা, যিনি তাঁর (সা.) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী ও সমস্ত প্রথম ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আউয়ালীন ও আখেরীনদের উপরে উন্নীত করেছেন।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ১১৮)

"যদি কোন নবীর শ্রেষ্ঠত্ব, সেই নবীর সেই কর্মের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়, যে কর্মের দ্বারা তাঁর মানুষের প্রতি ভালবাসা অন্য সব নবীদের চাইতে অধিক বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে, হে লোক সকল উঠো এবং সাক্ষ্য দান কর যে, এক্ষেত্রে পৃথিবীর বুকে মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন তুলনা নেই। ..... অন্ধ সৃষ্টি-উপাসকরা সেই মহান নবীকে (সা.) চিনতে পারে নি, যিনি সত্য সহানভূতির হাজারো দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।"

(তবলীগে রিসালত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০)

তিনি (আ.) বলেন-

আঁহযরত (সাঃ) এর জীবন এক অতিশয় সফল জীবন ছিল। উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্টের দিক থেকে হোক বা পবিত্রকরণ শক্তির দিক থেকে হোক কিম্বা অদম্য সাহসিকতার দিক থেকে হোক বা নিজের শিক্ষার সৌন্দর্য ও পূর্ণতার দিক থেকে হোক পরিপূর্ণ আদর্শের দিক থেকে হোক বা দোয়া গ্রহণীয়তার দিক থেকে হোক- মোটকথা তিনি (সাঃ) সকল দিক থেকে উজ্জ্বল সাক্ষ্য এবং নিদর্শন নিজের সঙ্গে রেখেছেন যা দেখে এক নির্বোধ ব্যক্তিও যার মধ্যে অযথা হঠকারিতা ও বিদ্বেষ নেই সে-ও এই কথা স্বীকার করতে হবে যে, তিনি (সাঃ) تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللهِ -এর পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত ও পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন।

(আল হাকাম নম্বর ৩ পঞ্চম খণ্ড, ১০ই এপ্রিল ১৯০২)

يارب صل على نبيك دائماً
فى هذه الدنيا وبعثٍ ثانى

**********

## জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যকে ২০১৭ সালের কাদিয়ান জলসা সালানার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

**দোয়াপ্রার্থী:**

**মির্যা নাঈমা বেগম, জামাত আহমদীয়া বিথারী, উঃ ২৪ পরগনা**

# পুণ্যকর্ম এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করার শিক্ষা

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۘ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۘ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۘ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (المائدہ:3)

এবং কোন জাতির এইরূপ শত্রুতা যে, তাহারা তোমাদিগকে মসজিদে-হারাম হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, তোমাদিগকে যেন সীমালঙ্ঘন করিতে প্ররোচিত না করে। এবং তোমরা পুণ্যকাজে এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করিও না। আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

(আল মায়েদা: ৩)

## নিজ প্রাণের উপর অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার শিক্ষা

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۘ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (الحشر:10)

এবং (এই মাল) তাহাদেরও জন্য যাহারা তাহাদের (হিজরতের) পূর্বে (মদীনায়) বাসগৃহে বসবাস করিতেছিল এবং ঈমান আনিয়াছিল; তাহারা তাহাদিগকে ভালবাসে যাহারা তাহাদের নিকট হিজরত করিয়া আসে, এবং তাহারা নিজেদের বক্ষঃস্থলে সেই সম্পদের জন্য কোন আকাঙ্খা বোধ করে না যাহা তাহাদিগকে (মুহাজেরীনকে) দেওয়া হয়, এবং নিজেদের দারিদ্র থাকা সত্বেও তাহাদিগকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়। এবং যাহাকে তাহার আত্মার কৃপণতা হইতে রক্ষা করা হয়, তাহারাই বস্তুতঃপক্ষে সফলকাম।

(আল-হাশর: ১০)

সম্পাদকীয় -এর ৪০ পাতার পর ...

পারে। এটি স্পষ্ট যে, জীবিত ধর্ম সেটিই যেটির সঙ্গে ঐশী নিদর্শন রয়েছে এবং পূর্ণ বিশিষ্টতার জ্যোতিঃ তার মাথায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। আর সেই ধর্ম হল ইসলাম। খৃষ্টান, শিখ কিম্বা হিন্দুদের মধ্যে কি এমন কোন ব্যক্তি আছে যে এ বিষয়ে আমার মোকাবেলা করবে? অতএব আমার সত্যতার জন্য এই 'হুজ্জত' (অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা নিরুত্তর করে দেওয়া) যথেষ্ট যে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ টিকে থাকতে পারে না। এখন যেভাবে চাও নিজেদের মনকে আশ্বস্ত কর যে, আমার আগমণে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে যা কুরআনের অভিপ্রায় অনুসারে বারাহীনে আহমদীয়ায় বর্ণিত হয়েছে আর সেটি হল-

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ-

( তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৯)

আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন পৃথিবীতে একত্ববাদের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করেন, মানুষের মনে একত্ববাদের ভালবাসার সঞ্চার করেন, মানবজাতির মনোযোগ ইসলামের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে তাদের মুক্তি ও সমৃদ্ধির উপকরণ সৃষ্টি করেন। আমীন।

(মানসুর আহমদ মাসরূর)

**********

**আনুগত্য সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-**

**'আনুগত্য এমন একটি বিষয় যদি বিশুদ্ধচিত্তে অবলম্বন করা হয় তাহলে হৃদয়ে এক জ্যোতিঃ এবং আত্মায় এক তৃপ্তি ও দ্যুতি সৃষ্টি হয়। চেষ্টা-সাধনার এতটা প্রয়োজন নেই যতটা আনুগত্যের প্রয়োজন। কিন্তু একটি শর্ত আছে, তাহলো সত্যিকার আনুগত্য।'**

**(আল-হাকাম- ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০১)**

# হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.)-এর অসাধারণ সেবা

ফালাহুদ্দীন কমর, মুরুব্বী সিলসিলা অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলাম, সহ-সম্পাদক,বাংলা বদর

সুধী পাঠকবর্গ! আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তার দেহগঠনে ভারসাম্য রাখা হয়েছে আর তার সুসাস্থ্যের জন্য দিক-নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। মানুষ অনেক সময় অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন পদ্ধতির কারণে এই মহান নেয়ামত হারিয়ে বসে, কিন্তু খোদা তা'লা পরম দয়ালু, তিনি মানুষের সুসাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন উপকরণ সৃষ্টি করে রেখেছেন। যেমন তিনি বলেন:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

অর্থাৎ আর আমি অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। (আশ-শোআরা: ৮১)

অনুরূপভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوْتَ অর্থাৎ প্রত্যেকটি ব্যাধির জন্য ঔষধ আছে।

হাদীসে আরও বলা হয়েছে-

الْأَبْدَانِ وَعِلْمُ الْأَدْيَانِ الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ

অর্থাৎ জ্ঞান মূলত দুটিই। একটি হল শারিরবিদ্যা বা চিকিৎসাশাস্ত্র এবং দ্বিতীয়টি হল ধর্মের জ্ঞান। বর্তমান যুগে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে এই দুটি জ্ঞানের ধারাই দুর্বার গতিতে বয়ে চলেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একদিকে যেমন পৃথিবীকে ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি অপরদিকে তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী ও চতুর্থ খলীফা হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে মানবজাতির অসামান্য সেবা করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি তাঁর হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে মানবসেবার বিষয়ে কিছু তুলে ধরতে চাই।

### মায়ের বাসনার পূর্ণতা লাভ

তাঁর মায়ের (মরহূমা) বাসনা ছিল তিনি ডাক্তার হবেন। একথার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন: আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল আমি ডাক্তার হই। সব সময় আমাকে বলতেন, ডাক্তার হও, পড়াশোনা করো।"

হযরত সাহেবযাদা সাহেব নিজেই বলেন: তিনি স্কুল-কলেজের পড়াশোনার প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাতেন না। পাঠ্যক্রমের বই-পুস্তক পড়ে সফলভাবে একের পর এক ধাপ উত্তীর্ণ হতে থাকেন, কিন্তু সেই সফলতা এমন মানের ছিল না যা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য যথেষ্ট হতে পারে। এই কারণে তিনি শিক্ষাজীবনে এই দিকে পা বাড়ান নি। আল্লাহ্ তা'লার রীতি হল, তিনি যদি নিজের নৈকট্যভাজনদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করেন তবে সেই বাসনাকে তিনি গ্রহণযোগ্য দোয়ায় রূপায়িত করেন এবং বিশেষ প্রজ্ঞার অধীনে উৎকৃষ্টতর কোন উপায়ে তা গ্রহণ করে থাকেন। হযরত উম্মে তাহের (রা.) 'দোয়াগু' ছিলেন এবং তাঁর দোয়া কবুলও হত। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে তাঁর দোয়া সমূহ কবুল করেছেন সেকথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ) বলেন:

" এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বানিয়েছেন। গোটা পৃথিবীর মানুষের সেবা করছি, বই লিখেছি, মানুষকে ওষুধ পাঠাই। তাই আমার মায়ের বাসনাও পূর্ণ হয়েছে আর আমিও সেবার সুযোগ পেয়েছি। আমি যদি ডাক্তার হতাম তবে বর্তমান যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা সম্পাদন করা কঠিন হত।"

(আল-ফযল, ২৯শে জানুয়ারী, ২০০১)

### হুযুরের মাধ্যমে হোমিওপ্যাথির প্রচলন

খিলাফতের পূর্বেই হুযুরের মধ্যে হোমিওপ্যাথি ও এর দ্বারা মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা করার উদগ্র বাসনা ছিল।১৯৬০ সালের কাছাকাছি তিনি বাড়িতেই ওষধ দেওয়া শুরু করেন এবং ১৯৬৮ সালে ওয়াকফে জাদীদের দাতব্য হোমিও ডিসপেন্সারির সূচনা করেন। তখন এখান থেকেই রুগীদের চিকিৎসা করতেন। তিনি ১৯৯৪ সালের ২৩ শে মার্চ থেকে এম.টি.এ-তে হোমিওপ্যাথি ক্লাস আরম্ভ করেন এবং সেখানে বিভিন্ন রোগ, ওষুধের গুণাবলী এবং আরোগ্য লাভের বিস্ময়কর সব ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। প্রায় ১৭০ টি ক্লাসের রেকাডিং-এর পর সেগুলিকে সদৃশবিধান চিকিৎসা বা হোমিওপ্যাথিও নামক পুস্তকের আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশ পেয়েছে।

হুযুর সমধিক হারে দাতব্য হোমিওপ্যাথি ডিসপেন্সারী প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিও উৎসাহিত করেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, জামাতের মানুষকে যেন এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। বর্তমানে ব্রিটেন সমেত পৃথিবীর একাধিক দেশে এমন হোমিওপ্যাথিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যেখানে আহমদী, অ-আহমদী নির্বিশেষে দাতব্য চিকিৎসা গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছেন। হুযুর (রহ.)-এর লেকচার এবং পুস্তকের কল্যাণে ঘরে ঘরে ছোট ছোট হোমিওপ্যাথি ডাক্তার তৈরী হয়েছে যারা সাধারণ অসুখ-বিসুখে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে সক্ষম আর অনেক দক্ষ চিকিৎসকরাও হুযুর (রহ.)-এর অভিজ্ঞতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের গুণগ্রাহী।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপর একবার ইলহাম হয় 'ইন্দাল মুয়ালিজাতে' এবং ১৮ অক্টোবর ১৯০২ সালে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের পক্ষ থেকে একটি ওষুধ ভর্তি বাক্স এসেছে এবং সেই বাক্সে ছোট ছোট ওষধের শিশি রাখা আছে।

এই স্বপ্নটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে হোমিও প্যাথির প্রচলন এবং সমগ্র বিশ্বে ওষুধের বাক্স পাঠানোর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে।

(আল-ফযল, ১৬ই আগস্ট, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা:২)

নিঃসন্দেহে এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তনকারী ছিলেন জার্মান চিকিৎসাবিদ হ্যানিম্যান স্যামুয়েল, কিন্তু এটিকে একটি বিশ্বজনীন ও সংগঠিত জামাতের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এবং অসংখ্য রুগীর চিকিৎসা করার আন্তর্জাতির ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্বের দাবিদার হলেন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ)। বেদনাক্লিষ্ট মানবতার সেবার জন্য তাঁর মন সব সময় ব্যাথিত ও ব্যাকুল হয়ে থাকত।

(দৈনিক আল-ফযল, সৈয়্যদানা তাহের সংখ্যা, ২৭শে ডিসেম্বর, ২০০৩, পৃষ্ঠা: ২২)

### হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে হুযুরের অবদান

হোমিওপ্যাথির পাশাপাশি সঠিক হোমিওপ্যাথি নিয়মাবলী উপেক্ষিত হয়ে আসছিল আর স্বয়ং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরাই এই সঠিক নিয়মাবলী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে সেগুলিকে ভুলে বসে ছিল। অথচ যে নীতিসমূহের উপর হোমিওপ্যাথি প্রতিষ্ঠিত সেগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ না করলে এই চিকিৎসাপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ উপকার পাওয়া যেতে পারে না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্র এক্ষেত্রে অবদান অনস্বীকার্য যে, তিনি হোমিওপ্যাথির প্রকৃত দর্শন এবং সঠিক পথে অনুশীলন করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং কেবল ব্যবসা বা অর্থ উপার্জনের স্বার্থে এটিকে বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন।

হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করার সময় তিনি এর নীতি অনুসারে ব্যক্তিত্ব বা individualization এর উপর গুরুত্ব দেন। প্রত্যের রুগীর লক্ষণ ভিন্ন হয়ে থাকে আর পৃথক পৃথক রুগী দেখে ওষুধ নির্বাচন করা উচিত আর রোগের নামে ওষুধ নির্বাচন করার পরিবর্তে রুগীর লক্ষণ দেখে ওষুধ নির্বাচন করা উচিত।

হুযুর (রহ.) বলেন: হোমিওপ্যাথিতে কোন নির্দিষ্ট বা ছকের ব্যবস্থাপত্র চলতে পারে না। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, কিছুক্ষণের জন্য রোগ ভুলে গিয়ে রোগীকে নিরীক্ষন করে তার ব্যক্তিগত লক্ষণাবলীকে দৃষ্টিপটে রাখুন। ঠান্ডা ও গরমের ওষুধ পৃথক পৃথক স্মরণে রাখতে হবে, তাতে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

যেমন- কোন কোন রোগীর প্রকৃতি উগ্র হয়, তাকে ঠান্ডা মেজাজের ওষুধ দিলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হবে। রোগীর মেজাজের অভিমুখ ভালভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে কোন রুগী এমন আছে গরমে যার ক্ষতি হয় বা ঠান্ডাতে রোগ বৃদ্ধি পায়, বা নড়াচড়া ও চলাফেরা করলে রোগের ক্ষতি হয় বা আরাম করলে কষ্ট বাড়ে। এই বিষয়গুলি যদি আয়ত্ব হয়ে যায় তবে রুগীর সঙ্গে কথা বলার সময় রোগ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রেখে রুগীর দিকে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়।

( দৈনিক আল-ফযল, ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৫)

পৃথিবী ব্যাপি আহমদীদের মনে তিনি হোমিওপ্যাথির প্রতি এক অনুরাগ ও আকর্ষন সৃষ্টি করেছেন এবং প্রায় ঘরে ঘরে, গ্রামে-গঞ্জে এবং শহরে হোমিওপ্যাথি ডিসপেন্সারী খোলার ক্ষেত্রে মূখ্য ভুমিকা পালন করেন। এম.টি.এ-তে তাঁর লেকচার, এবং ১৯৯৬ সনে সদৃশবিধান চিকিৎসা পদ্ধতি নামে প্রকাশিত হয়ে জনসম্মুখে আসা পুস্তকটি থেকে লাভবান হয়ে ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার তৈরী হয়েছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি দ্বারা মানবজাতির সেবার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা ও সাধনা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একজন মহান আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে দৈহিক রোগ নিরাময় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রেও উৎকর্ষ সাধন করেন, কেননা তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন সংযুক্ত হয়েছিল। শত শত দুরারোগ্য ব্যধিগ্রস্ত মানুষ তাঁর ওষুধ এবং দোয়ার মাধ্যমে নতুন জীবন লাভ করেছেন।

## হুযুর (রহ)-এর হোমিওপ্যাথি ক্লাসের লেকচার

মানবজাতি এ বিষয়ে তাঁর কাছে এই কারণে ঋণী হয়ে থাকবে তিনি হোমিওপ্যথি চিকিৎসা পদ্ধতি গোটা বিশ্বে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং এম.টি.এ-র মাধ্যমে পৃথিবী ব্যপি হোমিওপ্যাথির এই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসার করেছেন, যার ফলে কয়েক বছরের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ এই বিষয়ে ব্যুতপত্তি অর্জন করেছে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মানুষ এই চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে উপকৃত হচ্ছে। তিনি ১৯৯৪ সালের ২৩ শে মার্চ হোমিওপ্যাথি ক্লাস আরম্ভ করেন। এই ক্লাসে তিনি লেকচার দেন এবং বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য ওষুধ প্রস্তাব করেন, রোগের বিবরণ এবং প্রস্তাবিত ওষুধের প্রয়োগ বিধিও বিশদে বর্ণনা করেন। এইভাবে তাঁর পাঠ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে গেছে এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য হয়ে গেছে। এখন এই পুস্তক সমগ্র পৃথিবীতে প্রত্যেক চিকিৎসককে পথ-প্রদর্শন করছে। এর ইংরেজি অনুবাদ Homoepathy like cures like নামে উপলব্ধ আছে।

আমেরিকার মাননীয় সৈয়্যদ সাজেদ আহমদ সাহেব হোমিওপ্যাথির এই কল্যাণের দিকটি উল্লেখ করে লেখেন: হোমিওপ্যাথির এই পাঠের কল্যাণে আমরা বছরের পর বছর ধরে পরিবারে সামান্য অর্থের ওষধের বিনিময়ে ঋতুজনিত রোগ-ব্যাধির আক্রমণ প্রতিহত করছি। একবার এক চিকিৎসক আমার একটি অস্ত্রোপচারের খরচ বলেছিলেন আনুমানিক এক হাজার মার্কিন ডলার। আমি চিন্তা করলাম প্রথমে হোমিওপ্যাথি চেষ্টা করে দেখা উচিত। যা কিছু আমি হুযুরের লেকচার এবং পুস্তক থেকে অনুধাবন করতে পেরেছিলাম সেই অনুসারে ওষুধ সেবন আরম্ভ করি এবং দোয়া করি। কিছু সময় পর সেই ডাক্তারই যখন আমার নাক পরীক্ষা করে দেখেন, তখন তিনি বড়ই আশ্চর্য হন যে সমস্ত Polyps নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তিনি আরও আশ্চর্য হন যে, সেই ওষুধের মূল্য মাত্র কয়েক ডলারের বেশি ছিল না।

( খুলফায়ে আহমদীয়াত কে তাহরীকাত অউর আপকে শিরিঁ সামরাত, পৃষ্ঠা: ৪৬৯)

## চিকিৎসক হিসেবে হুযুর (রহ)-এর সেবা

হুযুর (রহ.) একজন সফল এবং উৎকৃষ্টমানের হোমিওপ্যাথ ছিলেন। বাহ্যতঃ হুযুর (রহ.)-এর কাছে কোন ডিগ্রি ছিল না, আর না তিনি কোন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু খোদা তা'লা তাঁকে বিশেষ কৃপায় এই জ্ঞানে ভুষিত করেন এবং একজন সফল হোমিওপ্যাথ হিসেবে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেন।

হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে হুযুর (রহ-)-এর সেবা বিশ্বজনীন ছিল। তাঁর কল্যাণের বৃত্ত কোন একটি বিশেষ দেশ বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং পৃথিবীর প্রমূখ দেশগুলি থেকে বিভিন্ন ধরণের ব্যাধিতে পীড়িত মানুষ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে আল্লাহ্র কৃপায় আরোগ্যতা লাভ করেছে। তাঁর হাতে আরোগ্যলাভের অসংখ্য বিস্ময়কর এবং ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ঘটেছে। এমন অলৌকিকভাবে আরোগ্যলাভের এমন হৃদয় আলোড়নকারী অসংখ্যাঘটনা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটেছে।

## হোমিওপ্যাথি নিয়ে হুযুর (রহ)-এর নিজের উপর গবেষণা

তিনি প্রথমে নিজের উপর অসংখ্য সফল পরীক্ষা করেন এবং নিজের পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজনদের সফলভাবে চিকিৎসা করেন এবং পরবর্তীতে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা আরম্ভ করেন। ক্রমেই তিনি একজন সফল হোমিওপ্যাথ হিসেবে খ্যাত হয়ে ওঠেন। তিনি নিজের শরীরের উপর হোমিওপ্যাথি নিয়ে যে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন সেগুলির কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল।

তিনি (রহ.) লেখেন: ভারত বিভাজনের পর পাকিস্তান গঠনের প্রারম্ভিককালের কথা। আমার ঘন ঘন মাথা ব্যাথা হত যাকে ইংরেজিতে মাইগ্রেন বলা হয় আর উর্দুতে বলা হয় দরদে শাকিকা ( আধ কপালি)। এর যন্ত্রণা তীব্র হয়ে থাকে যার সঙ্গে বমি বমি ভাব এবং স্নায়বিক অস্থিরতাও থাকে। আমি কয়েকদিন পর্যন্ত এই যন্ত্রণা ভোগ করতাম। চিকিৎসা হিসেবে স্পিরিন খেতাম যার কারণে লিভারের ঝিল্লি এবং কিডনির উপর কুপ্রভাব পড়ত এবং হৃৎপিণ্ডের গতিও বেড়ে যেত। আমার পিতা (মরহুম) নিজের কাছে সান্ডোল (Sandole) নামে একটি এ্যালোপ্যাথি ওষধ রাখতেন যেটি তাঁর নিজেরও প্রয়োজন পড়ত। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাজনের পর সেই ওষধটি পাকিস্তানে পাওয়া যেত না, কোলকাতা থেকে আনাতে হতো। এই ওষধটিতে দ্রুত আরাম পাওয়া যেত।"

অনুরূপভাবে তিনিও অন্যত্র বলেন: ১৯৬০ কিম্বা ১৯৬২ সালে আমার প্রথম এপেনক্সিের আক্রমণ হয়। এই ওষুধটি সেবন করার (আর্নিকা) পর আল্লাহ্র কৃপায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠি। এরপর কখনও কখনও ব্যাথা হত যা এই ওষুধ সেবনেই ঠিক হয়ে যেত। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে নি। এছড়াও ১৯৭২ সালে সফরকালে এই ব্যাধিটি ভীষণ হয়ে দেখা দেয়। তার উপর আমি গাড়িও চালাচ্ছিলাম এবং সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও ছিল। জ্বর কমছিল না। আমি অনবরত ওষুধ সেবন করতে থাকি এবং চারশো মাইল পথ অতিক্রম করে করাচি পৌঁছাই। ডাক্তাররা অস্ত্রোপচার করে দেখে হতভম্ব হয়ে যান যে, এপেন্ডিক্স ফেটে গিয়েছিল। সেখানে যত্রতত্র ছিদ্র দেখা যাচ্ছিল যেগুলি থেকে পুঁজ বের হয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারের মন্তব্য অনুযায়ী এমন রুগী কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মারা যায়, কিন্তু সেই চিকিৎসাবিধিটি আমাকে মরণাপন্ন পরিস্থিতি থেকেও রক্ষা করে।"

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, পৃষ্ঠা: ১১৮)

## সাধারণ মানুষের অলৌকিকভাবে আরোগ্যলাভের ঘটনাবলী

হুযুর (রহ.) তাঁর নিজের এবং আত্মীয়-পরিজনের উপর সফলভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সাধারণ মানুষের চিকিৎসা আরম্ভ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হাজার হাজার মানুষ তাঁর হাতে আরোগ্য লাভ করে।

* মৃগীর চিকিৎসার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন: দৈনন্দিন চিকিৎসার সময় একথা স্মরণ রাখবেন যে, যে সমস্ত রোগী গভীর এবং পুরনো ব্যধিতে আক্রান্ত হয়, যেমন-মৃগী, তবে তাদের কাজ চালানোর মত ওষুধ দেওয়া সঠিক নয়, বরং সময় বের করে এমন রোগীদের সঙ্গে বিশদে আলোচনা করা উচিত এবং রোগ সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করে তাদের প্রকৃতি অনুসারে ওষধ নির্বাচন করা উচিত। ..... কিছু কিছু ওষুধ এমন আছে মৃগীর রোগে যেগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় না। যেমন- একজন রুগী মাথায় চেঁচামেচি অনুভব করছিল এবং সেই চেঁচামেচির কারণে ব্যাথা অনুভব হত যা সে সহ্য করতে পারত না এবং সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত আর ঘুমোতে পারত না। মন ও

মস্তিষ্কে শিকলে জড়ানো রয়েছে বলে অনুভব হত। আমি তাকে ক্যাকটাস (Cactus) দিয়েছিলাম, যা তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দেয় আর সে স্বস্তিতে ঘুমোতে আরম্ভ করে এবং সে মৃগী থেকে মুক্তি পায়। অথচ মৃগীর ওষুধে ক্যাকটাসের কোন উল্লেখই নেই।

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: xi)

* কিডনির ব্যাথার চিকিৎসার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন: জটিল ও পুরনো রোগের ক্ষেত্রে রোগীকে অবশ্যই সামনে বসিয়ে তার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হবে। একবার কিডনির একজন রুগী নিয়ে আমার এমনই অভিজ্ঞতা হয়। আমি রোগের তাৎক্ষণিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাকে একোনাইটাম (Aconitum) এবং (Belladona) বিখ্যাত নুসখা দিতে থাকলাম, কিন্তু কোন উপকার হল না। তখন আমার মনে স্মরণে হল যে, আমি তাকে সেই ওষুধ দিচ্ছি যা তখনই কাজে আসে যখন গরম রুগীর ক্ষতি করে আর ঠান্ডা উপকার করে। ঠান্ডা পানিতে স্নান করতে সেই রুগীটির খুব কষ্ট হত। আমি এই বিষয়টি সামনে রেখে যখন তাকে ম্যাগ ফস ( Mag Phos) এবং কোলেসিন্থিস (colocynthis) একসঙ্গে দিলাম তখন সে দেখতে দেখতে ঠিক সুস্থ হয়ে উঠল।"

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: xii)

গ্যাংরিনের মত মারণ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: " এক যুবকের হাত মেশিনে থেঁতলে গিয়েছিল; ক্ষত শুকাচ্ছিল না এবং জখম আরও বিগড়ে গিয়ে গ্যাংরিনে পরিণত হয়। ডাক্তার আশাহত হয়ে প্রথমে আঙ্গুল এবং পরে হাত কেটে ফেলার পরামর্শ দেন। আমি তাকে আর্সেনিক (CM) প্রস্তাব করি। সপ্তাহ বা দশ দিন পর আবার সেই ওষধটি সেবন করার পরামর্শ দিই। কয়েক সপ্তাহ পরে সে আমাকে লিখে জানাই যে, ব্যাথা রয়েছে কিন্তু, কালোভাব হারিয়ে গিয়ে ক্রমশঃ গোলাপিভাব ফিরে আসছে। আল্লাহর কৃপায় কিছু সময় পরেই তা সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যায় আর হাত কাটানো তো দূরের কথা তার আঙুল পর্যন্ত কাটতে হয় নি।

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৬)

ক্যান্সারের মত মারণরোগ থেকে আরোগ্য লাভের অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করতে তিনি বলেন: যদি প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড, কিডনী এবং পিত্তথলির রোগ-ব্যধিতে আর্সেনিকের লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়, কিন্তু কেবল আর্সেনিকই যথেষ্ট না হয় তবে সেক্ষেত্রে ফসফরাস সহায়ক হতে পারে। আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দুটিকেই একটির পর অন্যটি ব্যবহার করে অনেক উপকার পাওয়া গেছে। এই ব্যবস্থাপত্রটিই ক্যান্সার নিরাময়ের ক্ষেত্রেও অনেক কার্যকরী প্রমাণিত হতে পারে। এই বিধিটি এমন একজন রোগীর উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল যার সম্পর্কে ডাক্তারদের ঘোষণা ছিল যে রোগীর আয়ু এক সপ্তাহের বেশি নয়; কিন্তু এই ওষুধ দুটি প্রয়োগের পর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। আর খোদা তা'লার কৃপায় সেই রোগী এরপরও কোন কষ্ট ছাড়াই একবছর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল।

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৭)

পোলিও-র চিকিৎসা সম্পর্কে তিনি বলেন: একটি শিশুর পা পোলিও-র আক্রমণে বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। তাকে সালফার এবং ব্রাইটা কার্ব দেওয়ার ফলে স্পষ্ট ফল পাওয়া গেল। এখন সে সাধারণ জীবন যাপন করছে। যদিও পুরোপুরি সুস্থ নয়; কিন্তু চলাফেরা করে। অথচ ডাক্তাররা বলেছিলেন যে, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশঃ তার কষ্ট বাড়বে।

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩১)

ফুসফুসে ছিদ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার নিদর্শনমূলক আরোগ্য লাভ সম্পর্কে তিনি বলেন: এক মহিলার 'সিল'-এর কারণে ফুসফুসে ছিদ্র হয়ে যায় আর ডাক্তারদের কাছে এটি দুরারোগ্য ছিল। হোমিওপ্যাথিতে তাকে মার্ক সল (Merc Sol) ২০০ এবং কারি কার্ব ৩০ দেওয়া হলে কয়েক মাসের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। হাসপাতালে ডাক্তারা এক্সরে করে সেই ছিদ্রগুলির কোন চিহ্ন পর্যন্তও খুঁজে পায় নি। এ যে সেই রুগী তা তারা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হচ্ছিল না।"

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৪)

ভয়াবহ হাঁপানীর চিকিৎসার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন: একবার হাঁফানীর এক রুগী এমনই শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। (বুক ভর্তি কফ ও শ্লেষ্মা ছিল)। আমি তাকে কার্বোভেজ দিলাম যার ফলে সে তৎক্ষণাৎ শক্তিলাভ করল। সে কফ বের করে ফেলল আর বন্ধ হতে শুরু করা শ্বাস স্বাভাবিক গতি ফিরে পেল। এরপর হাঁপানীর চিকিৎসা করা হল আর সেই রুগী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠল। কার্বোভেজ এমন একটি ওষুধ যা অত্যন্ত সংকটময় মূহুর্তে কাজে আসে। হাঁপানী রোগের ক্ষেত্রে এর বিশেষ লক্ষণ হল ঠান্ডা ঘাম বের হয় আর রুগীর শরীর ভিজে যায়; কিন্তু সে বাতাসে থাকতে চায়। অনেক সময় রুগীর মুখের উপর পাখা দিয়ে জোরে জোরে বাতাস করতে হয়।"

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৩)

চোয়ালের অস্থিতে ক্যান্সারের চিকিৎসা সম্পর্কে তিনি বলেন: এক রুগীনী এই রোগে খুবই কষ্ট পাচ্ছিল। তার চেহারার একদিক মারাত্মকভাবে ফুলে ছিল। চোখ বসে গিয়েছিল আর সে তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করত। একটি ভাল হাসপাতালে অনেক দিন ভর্তি ছিল; কিন্তু ডাক্তাররা কিছু করে উঠতে পারেন নি এবং অবশেষে তাকে অনারোগ্য ঘোষণা দিয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেন। আমি তাকে সালফার (CM)-এর একটি মাত্রা দিই যার ফলে তার যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। দুই সপ্তাহের মধ্যেই মুখের ফোলা স্পষ্টভাবে কমে যায়। এরপর আমি তাকে সাইলেসিয়া (CM) -এর একটি মাত্রা দিই। এর ফলে রোগ প্রশমিত হওয়ার গতি বেড়ে যায় যা পূর্বে থমকে গিয়েছিল। কিছু সময় পর সালফার(CM) পুনরায় দেওয়া হলে রোগ নির্মূল হয়ে যায়। এই ঘটনা কয়েক বছর হয়েছে আর আজ পর্যন্ত সে সুস্থ ও সবল রয়েছে।

* এপেনডিক্স থেকে অলৌকিক আরোগ্য লাভ: তিনি বলেন- আমি Iris Tenax কে Arnica এবং Bryonia -এর সঙ্গে ২০০ শক্তি মিলিয়ে এপেনডিক্সের ব্যাথায় বার বার সেবনের জন্য দিয়েছি আর এটি অত্যন্ত কার্যকরী সাব্যস্ত হয় আর এটি বিস্ময়কর প্রভাব দেখায়। যদি ধনুষ্টংকারের লক্ষণ স্পষ্ট হয় ব্রায়োনিয়ার পরিবর্তে বেলেডোন ব্যবহার করা উচিত। অনেক সময় এপেনডিক্স-এর কারণে অত্যন্ত ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় আর এই কষ্ট জটিল রূপ ধারণ করে নেয়। এই তিনটি ওষুধ একত্রে দিলে এই জটিলতাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮০-৪৮১)

ঘা বা ক্ষতের চিকিৎসা সম্পর্কে তিনি বলেন:-অন্ত্রে বা অন্য কোথাও ঘা বা আলসার থাকলে রুগীর লক্ষণাবলী পটাশিয়ামের কোন লবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে বিষয়ে জানতে হবে। এক রুগীর পায়ে গভীর ও পুরনো ক্ষত ছিল। আমি তাকে Kali Ioditum দেওয়ার ফলে কিছু দিনের মধ্যেই তার ঘা উধাও হয়ে যায়। এর পূর্বে সে উৎকৃষ্ট মানের সেনা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করিয়েছিল। আমি এজন্য কেবল দুটি ওষুধের প্রস্তাব করেছিলাম যে তার অন্যান্য লক্ষণাবলী পটাশিয়ামের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল।"

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮৬)

মদ্যাসক্তি থেকে মুক্তি: এক ব্যক্তি মদের প্রতি এতটাই আসক্ত হয়ে পড়েছিল যে, এক ঘন্টাও মদ ছেড়ে থাকতে পারত না। সে মদ্যাসক্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়ত, কিন্তু কখনো কোন চিকিৎসায় কোন উপকার হয় নি। আমি তাকে এক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড গ্লাসে পানিতে দিয়ে সেই পানি দিনে দুই-তিন বার করে সেবন করার পরামর্শ দিই। দুই তিন মাস পর তার সম্পর্কে সংবাদ পাই যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। বস্তুতঃ সে কয়েক দিনের মধ্যেই তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসে এবং মদের উপর বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে।"

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৯৭)

এমন রুগী যাদেরকে ডাক্তারারা অনারোগ্য বলে ঘোষণা করেছিল বা অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দিয়েছিল তারা হুযুরের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে। এমন রুগীদের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল-

হুযুর (রহ.) Varicose viens-এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন- অনেক সময় পায়ে নীল রঙের শিরাগুলি গুলি ফুলে ওঠে জালিকার মত হয়ে যায় যাকে Varicose viens বলা হয়। মেয়েদের মধ্যে এই সমস্য বেশি দেখা যায়।

শিরাগুলির মধ্যে রক্ত গাঢ় হয়ে জমতে থাকে। এলোপ্যাথিতে কেবল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেই এই চিকিৎসা করা হয়; কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে এমন অনেক ওষুধ আছে যেগুলির দ্বারা শিরার গন্ডগোল সারানো যেতে পারে, সেগুলির মধ্যে সালফার অন্যতম।"

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮০১-৮০২)

যকৃতের ক্যান্সারের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন: এমন অনেক রুগী দেখা গেছে ডাক্তার যাদের লিভার ক্যান্সারের রোগ নিশ্চিত করেছে আর নানান ধরণের রেডিয়েশন এবং ওষুধ প্রয়োগ করার পর অনারোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। আর যখন মনে হয়েছে রুগীর আয়ু দুই-থেকে তিন দিনের বেশি নয় তখন তারা সেই রুগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই সময় যখন এই বিধি প্রয়োগ করে (সালফার+ব্রায়োনিয়া ৩০+ কার্ডোস মেরিনাস+Q) তাদের চিকিৎসা করা হলে তিন দিনে মরে যাওয়ার পরিবর্তে সুস্থ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেল।"

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯০)

এই ব্যক্তি ছিলেন ওয়াকফে জাদীদের কর্মী উসমান আহমদ সাহেব। এরপর তিনি আরও চোদ্দ বছর জীবিত ছিলেন।

* সূর্য গ্রহণের কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন- " সূর্য গ্রহণের সময় সূর্যের দিকে তাকালে চোখের পর্দা রেটিনা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা সে ততক্ষণাৎ বুঝতে পারে না। কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে এর প্রভাব ফুটে ওঠে। বিক্ষিপ্তভাবে কালো দাগ দেখা দেয়। কখনো ডান চোখের দৃষ্টি দুর্বল হয় আবার কখনো বাম চোখের। ক্রমশ রুগী সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলে আর এমন অন্ধত্বের কোন চিকিৎসা জানা নেই। আজকাল রশ্মীর মাধ্যমে চিকিৎসার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে কিছুকালের জন্য উপকার হয়। এক্ষেত্রে মারকার উৎকৃষ্ট ওষুধ। একলক্ষ শক্তিমাত্রার দুটি ডোজ এক মাসের ব্যবধানে প্রয়োগ করলে আল্লাহ্‌র ফযলে অনেক উপকার পাওয়া যায়

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৫৬)

এলোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে অনারোগ্য ব্যধির ক্ষেত্রে হুযুর (রহ.)-এর প্রচেষ্টা: চিকিৎসার জগতে এই বিষয়টি বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকে যে, নিত্যনতুন রোগের প্রতিকারের জন্য ওষুধাবলী আবিষ্কার এবং নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়। বর্তমান যুগের কয়েকটি রোগের জন্য হুযুর (রহ) যে হোমিপ্যাথিক চিকিৎসা উদ্ভাবন করেছেন সেগুলির কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল।

(১) এইড্‌স-এর চিকিৎসা: বর্তমান কালে সমগ্র বিশ্বে এইডসের রোগ একটি ভয়াবহ বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে আজ পর্যন্ত এলোপ্যাথিতে কোন চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু হুযুর (রহ.) এম.টি.এ-র মাধ্যমে এই রোগের বিধি-ব্যবস্থা করেন। তিনি সাইলেসিয়া (CM) প্রস্তাব করেন। তিনি তাদেরও উদাহরণ তুলে ধরেন যারা এই ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করে দেখেছে এবং আল্লাহ্‌ তা'লা তাদেরকে এই মারণব্যধি থেকে পরিত্রাণ করেছেন।

এই অলৌকিক আরোগ্যলাভের বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন- 'এইড্‌সকেও ক্যান্সারের মতই একটি অনারোগ্য ব্যধি মনে করা হয়। বিভিন্ন দেশে আমার তত্ত্বধানে সাইলেসিয়া (CM) প্রয়োগ করে গবেষণা করা হয়েছে। অনেক রুগীর মধ্যে সাইলেসিয়া বিস্ময়কর প্রভাব দেখিয়েছে।"

(হোমিওপ্যাথি, সদৃশ বিধান চিকিৎসা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫৭)

(২) পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা থেকে প্রতিকার: পৃথিবী পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার বিভীষিকা সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যখন পাকিস্তান ও ভারত পারমাণু বোমা পরীক্ষণ করে। সেই সময় হুযুর (রহ.) বিশেষ করে উপমহাদেশের মানুষের জন এবং গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য এর কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পেতে এই ওষুধগুলি সেবন করার পরামর্শ দেন। তিনি Carcinosin CM এবং Radium Bromide CM প্রস্তাব করেন আর এই ওষুধ দুটিকে ব্যপক হারে ব্যবহার করানো হয়।

(৩) এলোমুনিয়ামের বিষক্রিয়া থেকে প্রতিকার: প্রাচীনকাল থেকেই এলোমুনিয়ামের বাসন ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু এলোমুনিয়ামের বিষ ধীরে ধীরে মানুষের শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে যা পরবর্তীতে ভয়ানক ব্যধিতে পর্যবসিত হয়। হুযুর (রহ.) এলোমুনিয়াম নির্মিত বাসনে খাদ্য গ্রহণের কুপ্রভাব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেন এবং এগুলি ব্যবহার না করার পরামর্শ দেন। তিনি এর কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পেতে অ্যালুমিনা ১০০০ শক্তি মাত্রায় ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

(দৈনিক আল-ফযল, ২৭ শে ডিসেম্বর, ২০০৩, পৃষ্ঠা:৬)

(৪)অনুরূপভাবে ক্যান্সারের টিউমার যেগুলি ত্বকের বহির্ভাগে প্রকাশ পায় সেগুলির ক্ষেত্রে কুনিয়াম অত্যন্ত কার্যকরী ওষুধ। কেননা, এর ফলে ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়েই সনাক্ত করা হয়। এমন স্ফিতিভাবের মধ্যে যদি ক্ষত তৈরী হতে আরম্ভ করে তবে শুদ্ধ মধুর প্রলেপ লাগালেও অনেক উপকার পাওয়া যায়। চিকিৎসা শাস্ত্র থেকেও একথা প্রমাণ হয়েছে যে, যেখানে কোন মলম কাজে আসে না, সেখানে মধু বিস্ময়কর ফল দেখায়।"

(দৈনিক আল-ফযল, ৩১ শে মার্চ, ২০০০, পৃষ্ঠা:১০)

মাননীয় মৌলবী আব্দুল করীম খালিদ সাহেব ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। তাঁর চিকিৎসার বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর সমীপে দোয়ার আবেদন করা হয়। তিনি (রহ.) মেডিক্যাল রিপোর্ট চেয়ে পাঠান আর লন্ডনে আহমদী ডাক্তারদের একটি বোর্ড গঠন করে তাদেরকে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পরামর্শ দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই রোগে এলোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে কোন প্রতিকার না থাকায় তিনি হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করার নির্দেশ দেন এবং সঙ্গে দোয়াও করেন। সেই সময় তাঁকে প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন রক্ত দিতে হত আর তাঁর ব্লাড লেভেল খুবই নীচে ছিল। তিনি ইকরা শহরের একটি প্রসিদ্ধ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন যেখানে প্রফেসরদের তত্ত্বাবধাং চিকিৎসা চলছিল, কিন্তু রোগ প্রশমিত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল না। এখন তাঁর হোমিও চিকিৎসা আরম্ভ হল। হুযুর (রহ.)-এর বিশেষ বেদনাতুর দোয়ার কল্যাণে এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় মৌলবী সাহেবের রোগ অলৌকিকভাবে অতি দ্রুত নিরাময় হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। ডাক্তাররা বিস্ময়াভিভূত ছিল যে, এমনটি কিভাবে সম্ভব হল! পরিশেষে ডাক্তারা বিবিধ প্রকারের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর তাকে সুস্থ ঘোষণা করে বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

এই ঘটনা ( হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা: ৪৮১-৪৮২ -তে উল্লেখিত) " সেই আব্দুল করীমের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় যাকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে পাগল কুকুরে কামড়েছিল। ডাক্তাররা তাঁকে Nothing Can be done for Abdul karim' বলা সত্বেও খোদা তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার কল্যাণে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে এক নতুন জীবন দান করেন।

যাইহোক মৌলবী আব্দুল করীম খালিদ সাহেব স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে পুনরায় বরাহীঙ্গ পৌছান এবং মুবাল্লিগ হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করা আরম্ভ করেন।

( পুস্তক: সীরাত ও সোয়ানেহ হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহ.) , অধ্যায়- এক কামিয়াব হোমিওপ্যাথ)

## হুযুর (রহ.)-এর অভিজ্ঞতার আলোকে হোমিওপ্যাথিতে মানসিক, চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) তাঁর রচিত হোমিওপ্যাথি পুস্তকে বিভিন্ন স্থানে এবিষয়টি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, কিছু কিছু রোগ-ব্যাধি যেগুলি বাহ্যতঃ চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাধি বলে প্রতীত হয়, বস্তত সেগুলি শারিরিক ব্যাধি আর হোমিওপ্যাথি ওষুধে সেগুলির উৎকৃষ্ট চিকিৎসা সম্ভব। এখানে কয়েকটির দৃষ্টান্ত দেওয়া হল-

* একটি হোমিও ওষুধ যার নাম হল ল্যাকেসিস। এটি সম্পর্কে তিনি বলেন- " ল্যাকেসিস lachesis-এর রুগী মারাত্মক প্রকারের সন্দেহে ভোগে। প্রথমের দিকে সে মনে করে যে সকলে তার বিরুদ্ধে কথা বলছে বা তার খাদ্যের মধ্যে

কিছু মেশানো হয়েছে। সে তার নিকট আত্মীয় ও প্রিয়জনদের উপরও সন্দেহ করে আর ক্রমশঃ এই লক্ষণগুলি প্রকট হতে থাকে। এমন রুগীদেরকে ল্যাকেসিস দেওয়া আবশ্যক। ”

(হোমিওপ্যাথি পুস্তক, নুতন সংস্করণ, সম্মিলিত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, সংশোধন এবং সংযোজন সহ রচয়িতা: হযরত মির্যা তাহের আহমদ)

এই ওষুধটি প্রসঙ্গেই তিনি বলেন: “একটি অসুস্থ মেয়েকে আমার কাছে নিয়ে আসা হয় যার মধ্যে চুরি করার বদাভ্যাস ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর দিত, আল্লাহ্‌র আদেশ তাই এমনটি করি। এমন রুগীর চিকিৎসা ল্যাকেসিস দ্বারা করতে হয়, যে খোদার হুকুমে তাঁরই অবাধ্যতা করে। ..... ধর্মের প্রতি ঝোঁক যদি অস্বাভাবিক রকমের উগ্র হয়ে ওঠে, তবে সেই উগ্রতা ল্যাকেসিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত; কিন্তু এর সব থেকে ভয়ঙ্কর লক্ষণ হল এই যে, তার মনে অনেক সময় এই ধারণার উদ্রেক হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে কাউকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছে। এমন রুগী অনেক সময় বাস্তবেও কাউকে খুন করে বসে বা হত্যা করার চেষ্টা অবশ্যই সে করে থাকে।”

(হোমিওপ্যাথি পুস্তক, নুতন সংস্করণ, সম্মিলিত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, সংশোধন এবং সংযোজন সহ পৃষ্ঠা: ৫৪৮)

তিনি আরও বলেন: ডক্টর কেন্টের মতে এই ওষুধটির সঙ্গে কোন বিশেষ অঞ্চলের সম্পর্ক নেই, বরং পৃথিবীর সর্বত্রই এই ওষুধটির কার্যকরিতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ল্যাকাসিসের বিষে যে ক্ষতিকর দিক ও উগ্রতা রয়েছে তা পৃথিবীর সকল দুরাচারী এবং বিকৃত মনস্ক মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ প্রবল বিদ্বেষ, অপরের ক্ষতি করার চেষ্টা এবং ফিতনা-কলহের দিকে ঝোঁক থাকা।

(হোমিওপ্যাথি পুস্তক, নুতন সংস্করণ, সম্মিলিত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, সংশোধন এবং সংযোজন সহ পৃষ্ঠা:৫৪০)

* আরেকটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ হল সালফার যার সম্পর্কে হুযুর বলেন-“ সালফারের রুগীর মধ্যে দার্শনিক হওয়ার বড় শখ থাকে আবার তার মধ্যে কয়েকজন দার্শনিক প্রকৃতিরও হয়ে থাকে। এই শখ যদি উন্মাদনায় পর্যবসিত হয় তবে উচ্চ শক্তিতে সালফার একটি বা দুটি মাত্রা দিলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে আবার অনেক অর্থনৈতিক দার্শনিক হয়ে থাকে যে সব সময় নানান ধরণের পরিকল্পনা করতে থাকে; কিন্তু বাস্তবে কোনটিই করে না। এরা অতি অলস প্রকৃতির হয়ে থাকে। কোন কাজে তাদের মন লাগে না। নিজেদের চিন্তাতেই ডুবে থাকে। এদের চিকিৎসার ক্ষেতেও উচ্চ শক্তিতে সালফার প্রয়োগ করতে হবে।

(হোমিওপ্যাথি পুস্তক, নুতন সংস্করণ, সম্মিলিত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, সংশোধন এবং সংযোজন সহ পৃষ্ঠা: ৭৮৪)

হুযুর (রহ.) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ওষধ ক্যামেমিলার রুগীর সনাক্তকরণ এবং এই ওষুধের আরও অন্যান্য লক্ষণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: ক্যামোমিলার স্থায়ী লক্ষণাবলীর মধ্যে একটি হল, এর রুগীদের মধ্যে উদারতার অভাব লক্ষ্যনীয়। এর প্রকৃতিতে কিছুটা স্থিরতা দেখা যায়। এরা অপরের বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করে না, আর না এরা অপরের কষ্ট অনুভব করে না অপরের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে; কিন্তু নিজেদের বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকে।সর্বক্ষণ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে আর ব্যক্তিগত স্বার্থকেই দৃষ্টিপটে রাখে। অপরের উপর সহসাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠাও এর প্রকৃতির অন্তর্গত।”

(হোমিওপ্যাথি পুস্তক, নুতন সংস্করণ, সম্মিলিত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, সংশোধন এবং সংযোজন সহ পৃষ্ঠা: ২৭১)

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ ন্যাট্রাম মিউর (Natrum Mur) সম্পর্কে তিনি বলেন: ন্যাট্রাম মিউরের রুগী মিথ্যা প্রেমেরবি শিকারে পরিণত হয়। অনেক বৃদ্ধাও এমন কৃত্রিম ভালবাসার খপ্পরে পড়ে। ভালবাসার চিকিৎসা যদি ওষুধ দ্বারা সম্ভব হয় তবে এমন মহিলার চিকিৎসা ন্যাট্রাম মিউর দ্বারা করা যেতে পারে।

(হোমিওপ্যাথি পুস্তক, নুতন সংস্করণ, সম্মিলিত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, সংশোধন এবং সংযোজন সহ পৃষ্ঠা: ৬১৯)

## উপসংহার

হুযুর (রহ.) হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে জামাতের পরিচয় ঘটিয়েছেন এবং এটিকে জামাতের মধ্যে বিস্তৃতি দিয়েছেন এবং দাতব্য চিকিৎসাকে সার্বজনীন করে দিয়ে সাধারণ মানুষের উপর এক বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। নিঃসন্দেহে লক্ষ লক্ষ আহমদী নিজেরাই হামিওপ্যাথি প্রয়োগ করে নিত্য দিনের রোগ ব্যাধিরচিকিৎসা করছে। এর ফলে তারা সুস্থ থাকার পাশাপাশি ডাক্তারদেরকে মোটা টাকার ফিস দেওয়া থেকে অনেকাংশে রেহাই পেয়েছে। এছাড়াও হাসপাতাল ও ওষুধের খরচাদিও সাশ্রয় করতে পারছে। তারা নিজেদের পাড়া প্রতিবেশীদেরও বিনামূল্যে চিকিৎসা করে মানবতার সেবার দায়িত্ব পালন করছে।

আমাদের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) চিকিৎসক, গবেষক এবং রুগীদের উদ্দেশ্যে নসীহত করতে গিয়ে বলেন-

“ আহমদী ডাক্তার ও গবেষকদেরকে এই মানবীয় সহানুভুতি নিয়ে রুগীদের চিকিৎসা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের চিকিসকগণ (রাবওয়া এবং আফ্রিকাতেও-) নিজেদের প্রেসক্রিপশনের উপরে ‘হুয়াশ শাফি’ লিখে থাকেন। যদি পৃথিবীর সর্বত্র ডাক্তারের এই শব্দটি লেখেন এবং এর অনুবাদও লেখেন তবে সেটিও অন্যদের উপর পুণ্যময় প্রভাব ফেলবে আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপা আকর্ষনকারী হবে এবং এই কারণেআল্লাহ্ তা'লা তাদের হাতে আরও বেশি আরোগ্য দানের ক্ষমতাও বৃদ্ধি করবেন। অনুরূপভাবে রুগীদেরকে এমনটি মনে করা উচিত নয় যে, অমুক ডাক্তার আমার চিকিৎসা করলে আমি সুস্থ হয়ে উঠব বা অমুক হাসপাতাল সব থেকে ভাল সেখানে গেলে সুস্থ হয়ে যাব। একথা ঠিক যে, সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগানো উচিত, কিন্তু এর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যেতে পারে না। বরং একথা ভেবে দেখা উচিত যে, আরোগ্য দানকারী হলেন আল্লাহ্ তা'লার সত্ত্বা।”

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১৯ শে ডিসেম্বর, ২০০৮, স্থান: বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন, উদ্ধৃতি: হুয়াশ শাফী লন্ডন, জুলাই ২০০৯, পৃষ্ঠা: ২-৩)

আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রার্থনা এই যে, তিনি আমাদেরকে হুযুর (রহ.)-এর নির্দেশাবলীর আলোকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি বুঝা এবং এর থেকে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন আর আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ সবল রাখুন, সকল ব্যাধিগ্রস্থদের আরোগ্য দান করুন দুঃখ ভারাক্রান্ত মানবতার সেবা করার তৌফিদ দান করুন। আমীন।


## হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার অসাধারণ প্রমাণ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ○ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ○ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ○

এবং সে যদি মিথ্যা রচনা করে আমাদের প্রতি আরোপ করত, তবে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধৃত করতাম; অতঃপর আমরা তার জীবন-শিরা কেটে দিতাম। (আল-হাকা: ৪৫-৪৭)

জামাতে আহমদীয়ার প্রাতিষ্ঠাতা হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ (আ.) খোদার শপথ নিয়ে ইসলামের সত্যতা এবং মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কথা একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত। এমন একাধিক উদ্ধৃতি সংকলন করে **‘খোদা কি কসম’** (উর্দু) নামে পুস্তকারে প্রকাশ করা হয়েছে। পুস্তকটি পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা পোস্ট কার্ড/ই-মেলের মাধ্যমে বিনামূল্যে সংগ্রহ করুন।

Email: Javidashu123@gmail.com
Mobile: 9866358609, 7569355609
Postal Address: Muhammad Javed Ahmad
H.No. 3-4-772, Opp.C.C.Shroff Hospital
BARKATPURA, KACHIGUDA HYDRABAD- 500027 (T.S)

বি.দ্র: পুস্তকটি ‘খোদার কসম’ নামে বাংলাতেও পাওয়া যাচ্ছে।

# জামাতে আহমদীয়ার মানব সেবা সম্পর্কে অন্যান্যদের অভিমত

এইচ শামসুদ্দীন কাওয়াশুরী, সম্পাদক বদর- মালায়ালাম অনুবাদ: জাহিরুল হাসান, মুবাল্লিগ সিলসিলা

ইসলাম একটি সমতার ধর্ম। এটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান উপস্থাপন করে। মানুষের ইহজগতে ও পরজগতের কল্যাণার্থে যা কিছু দরকার তার প্রত্যেকেটির সুষ্ঠ সম্পাদনের ইসলাম আদেশ দেয়। এই কারণেই ইসলামের মূল নীতি হল আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্ট মানবকুল উভয়েরই অধিকারসমূহকে যথাযথ উপায়ে আদায় করা। উভয় অধিকার সমূহের আদায়কারী কেবল আল্লাহ তা'লার কৃপাবারিই লাভ করে না বরং আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্ট জীবকুলও প্রশংসার অধিকারী সাব্যস্ত হয়।

## নবীগণের ইতিহাসের অসাধারণ উদাহরণ।

মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা নবীগণের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই। হযরত সালেহ (আ.)-এর পুণ্যচেতা হওয়ার দরুন তাঁর জাতি বিরোধীতা সত্বেও এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا (সূরা হুদ)

প্রত্যেক নবীর ব্যাপারে তাদের জাতিরা এই স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, এই ব্যক্তি এবং এর দল মানব সেবার ক্ষেত্রে সর্বদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই উৎকৃষ্ট ইতিহাসের সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা উন্নত দৃষ্টান্ত আমাদের প্রিয়তম নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর পবিত্র জীবনে পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলেছেন সমস্ত মানবকুল হল আল্লাহ্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। যদি কেউ আল্লাহ্ তা'লার পরিবারকে ভালবাসে এবং তাদের সেবায় নিয়োজিত হয় তবে সে আল্লাহ্ তা'লারও আশিসভাজন হয়ে ওঠে। একবার এক বৃদ্ধার বোঝা বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি নিজেকে তার সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। যখন তিনি সেই বুড়িমার বোঝা গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দেওয়ার পর ফিরে আসছিলেন তখন সেই বুড়িমা তাঁকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলে যে, ছেলে, যুগের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সাবধানে থাকবে। মনে রাখবে মহম্মদ (সা.) নামে এক ব্যক্তি এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে লোকদেরকে বিপথগামী করছে। তুমিও যেন তার জাদুর মায়ায় জড়িয়ে পড়ো না। একথা শুনে তিনি (সা.) হেসে বললেন যে, মা, যে মুহাম্মদের তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ আমিই তো সেই। একথা শোনা মাত্রই সেই ভাগ্যবতী মহিলা বললেন, যদি এমনটাই হয়ে থাকে, তবে আমিও আপনার উপর ঈমান আনছি।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

কখনও হারকিল বাদশাহর দরবারে তাঁর (সা.) চিরশত্রু আবু সুফিয়ান তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করতে বাধ্য হয় আবার কখনো শত্রুরা তাঁর দৃঢ় চিত্ততায় প্রভাবিত হয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের খাদ্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে আবেদন জানায় আর তিনি তাদের অকারণ শত্রুতাকে ভুলে গিয়ে খাদ্য প্রেরণের নির্দেশ দেন।

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মিউর লেখেন: " যতদূর ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সম্পর্ক তা কখনই বন্দীদের জন্য দুর্বিষহ ছিল না বরং নিশ্চিতভাবে সেখানে তারা বর্তমান যুগের রাজকীয় বন্দীদের অপেক্ষাও বেশি আরাম ভোগ করত। কেননা, আঁ হযরত (সা.) -এর দৃঢ় শিক্ষা এবং রাজত্বের উপর সতর্ক দৃষ্টি পাতের কারণে কাফের বন্দীরা মুসলমানদের যে পরিবারেই থাকুক তারা কখনও ভৃত্য বা দাস হয়ে থাকত না বরং তাদেরকে সেই পরিবারেরই সদস্য মনে করা হত। এবং তাদের আদর আপ্যায়ন অতিথিদের সমান করা হত। তাই আমরা দেখি যে, বদরের যুদ্ধ বন্দীদেরকে যারা সাধারণত ইসলামের নিকৃষ্টতম শত্রু ছিল, মুসলমানরা তাদের এমন আদর যত্নে রেখেছিল যে, তারা তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ছিল। এবং তাদের অনেকেই এহেন উত্তম আচরণে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, রচয়িতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃষ্ঠা: ৪৬৫)

অনুরূপভাবেব তাঁর প্রেমিক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও মানব জাতিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। একবার তিনি বলেন- আমি সকল মানব জাতিকে সেইরূপ ভালবাসি যেভাবে একজন স্নেহশীলা মা তার সন্তানকে ভালবাসে, বরং তার চেয়েও বেশি।" (আরবাঈন নং ১, পৃষ্ঠা: ৩৪৪, রূহানী খাযায়েন, ১৭ত খণ্ড)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কত চমৎকার বলেছেন-

اَحِبُّ اِلٰى مَنْ لَا يُحِبُّنِىْ مَحَبَّةً
وَاَدْعُوْ لِمَنْ يَّدْعُوْ عَلَىَّ وَيَهْذِرُ

অর্থাৎ আমি তো ভালবাসার আতিশয্যে তার দিকেও আকৃষ্ট হই যে আমার দিকে আকৃষ্ট হয় না আর আমি তার জন্য প্রার্থনা করি যে আমার জন্য অভিশাপ কামনা করে এবং বিদ্রুপ করে।"

(হামামাতুল বুশরা, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬২)

জামাতে আহমদীয়ার মানব সেবা সম্পর্কে অন্যদের অভিমত

দেশ বিভাজনের পর ১৯৫৫ সালে পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যা প্লাবিত হয়। কাদিয়ানে সেই সময় পাঁচশোর কাছাকাছি আহমদী বসবাস করত। তারাও এতে প্রভাবিত হয়। কিন্তু তারা নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির কথা চিন্তা না করে গম, চাল এবং জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ সমূহ ধর্ম নির্বিশেষে বন্যা কবলিত মানুষদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। এই আহমদীরা নিজেদের থেকে অন্যদের জন্যই বেশি চিন্তিত ছিল আর তারা কাদিয়ানের বাইরে গিয়ে মানব সেবার এক উৎকৃষ্ট নমুনা তুলে ধরেছিল। এর উল্লেখ করে স্যার বিষণ সিং উপমহাকুমা আধিকারিক বিট বিয়াস বলেন: " আমি বিট এলাকর বন্যা কবলিত গ্রামগুলিতে ত্রাণ বিতরণের উদ্দেশ্যে ২৬ শে অক্টোবর ১৯৫৫ থেকে আসা যাওয়া করেছি। আমি এটি দেখে খুশি হয়েছি যে, জামাত আহমদীয়া কাদিয়ান-এর বন্ধুরা অনেক দিন ধরেই এই গ্রামগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা ও অন্যান্য সাহায্য খুবই তৎপরতার সঙ্গে প্রদান করে চলেছে। জামাতের পক্ষ থেকে ফোরেচচি মৌজাতে একটি ত্রাণ শিবিরও খোলা হয়েছে যেখানে অসুস্থ ও সমস্যায় জর্জরিত মানুষদের সব ধরণের সাহায্য করা হচ্ছে। আহমদী যুবকদের সাহায্যকারী দলগুলি ওষুধপত্র, ত্রাণ সামগ্রী , বস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে বন্যা প্রভাবিত এলাকাগুলিতে সাহায্য করে চলেছে। আমি একথা বলতে পেরে আনন্দিত যে, যে মানব সেবার কাজ কাদিয়ানে আহমদী বন্ধুরা পূর্ণ সহানুভুতি এবং সেবার অনুপ্রেরণায় সম্পাদান করে চলেছেন এবং এর দ্বারা বিট এলাকার আক্রান্ত জনতার খুবই উপকার হয়েছে।

(বদর পত্রিকা, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৫)

১৯৯০ সালে ইরানে একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। যার ফলে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এমন বিপদের সময় আহমদীয়া জামাত তাৎক্ষনিকভাবে ইরান সরকারকে দুই লক্ষ ২০ হাজার টাকা সাহায্য প্রেরণ করে। এর ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিল্লী স্থিত ইরানী রাষ্ট্রদূত এই ভাষাতে বর্ণনা করেন।

"জামাতে আহমদীয়ার এই উল্লেখযোগ্য সেবা যা তারা ভূমিকম্পের সময় প্রদান করেছিল আমরা আন্তরিকভাবে তাদের এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। আমাদের এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন জামাতের নেতা এবং সাধারণ সদস্য অবধি যেন পৌঁছে দেওয়া হয়।"

(সাপ্তাহিক বদর, ২৩শে নভেম্বর, ২০০০, পৃষ্ঠা: ১৩৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ চতুর্থ (রহ) দেশ বিভাজনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

" আমার খুব স্মরণে আছে যে, এসব আশ্রয়হীনদের (দেশ বিভাজনের সময় যে সমস্ত শরণার্থীরা কাদিয়ানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল- অনুবাদক) নিয়মিত খাবার পরিবেশন করা হত। যেহেতু অবস্থা খুব সঙ্গীন মনে হচ্ছিল তাই হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) খুবই বিচক্ষণতা সাথে জলসা সালানার প্রয়োজনীয়তারও অধিক পরিমাণে গম মজুত করে রেখেছিলেন তাই আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সেখানকার একজন মুসলমানকেও ক্ষুধার্ত মরতে দেওয়া হয় নি। বরং অভাবীদের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে যৌতুকের মূল্যবান কাপড় অবধি তাদের মধ্যে বন্টণ করা হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ তৃতীয় স্বয়ং নিজ স্ত্রীর মূল্যবান কাপড় বন্টনের মাধ্যমে এই কাজের শুভারম্ভ করেন। হযরত বেগম সাহেবা যেহেতু মালে কোটলার নবাব পরিবারের কন্যা

ছিলেন তাই এই কাপড়গুলির মধ্যে কিছু কাপড় এত মূল্যবান আর ঐতীহ্যবাহী পারিবারিক পোশাদির মধ্য থেকে ছিল যা স্বয়ং তিনি কখনও পরতেন না যাতে নষ্ট না হয়ে যায়। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ তৃতীয় সর্বসমক্ষে এবং সর্বপ্রথম নিজের ঘরের কাপড়ের বাক্স খোলা শুরু করেন এবং মূহুর্তের মধ্যে এসব গরীব-দুঃখী যারা কখনও এমন পোশাকাদি পাওয়ার কল্পনাও স্বপ্নও দেখতে পারত না তাদের মধ্যে তা বন্টন করে দেন। প্রাপকরা প্রায় সবাই অ-আহমদী মুসলমান ছিল। এরপরে তো প্রতিটা পরিবারের সর্ব প্রকার বাক্সের ঢাকনা উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং তারা সঞ্চিত সব কিছুই আপন বিপদগ্রস্থ অ-আহমদী মুসলমান ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। সবশেষে যখন আমি কাদিয়ান থেকে বের হই তখন আমার কাছে একটি খাকি রং এর থলে ছিল যার মধ্যে মাত্র একজোড়া কাপড় অবশিষ্ট ছিল। এমনটি নয় যে কোন জিনিস আমি সঙ্গে আনতে পারতাম না, বরং আমাদের ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ খালি হয়ে গিয়েছিল এবং যা কিছু অবশিষ্ট ছিলা তা সব বন্টন করে দেওয়া হয়েছিল।"

"যেহেতু এই সব আশ্রয়হীনদেরকে দুর্বৃত্তরা একেবারেই নিঃস্ব ও একঘরে করে দিয়েছিল তাই কাদিয়ানের অধিবাসীরা এসব অসহায়দের পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করে। সাধারণভবে এতবড় জনসংখ্যার জন্য খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা কোন সাধারণ কাজ ছিল না। বিশেষ করে এমন দিনগুলিতে যখন কিনা জীবন ধারণের উপকরণগুলির খুবই অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল তাই এসব সহায় সম্বলহীন অতিথিরা কাদিয়ানের পরিচর্যায় ততদিন অবধি দিনাতিপাত করছিল যতদিন না পর্যন্ত সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের এ থেকে নিবৃত্ত না করেছে। "

জমিদার পত্রিকা লেখে-

'বাটালার আশ্রয়হীনদের খুবই করুন অবস্থা। তাদের মাথা ঢাকার জন্য না আছে কোন আশ্রয় আর না আছে খাবার জন্য কোন জিনিষ। দুর্বৃত্তরা তাদের উপর দুর্বিষহ নির্যাতন শুরু করেছিল। গয়নাগাটি এবং জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে যেতে আরম্ভ করে। এমনকি মহিলাদের সম্ভ্রমের লুট করে নেওয়াও আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় ক্যাম্পটি শ্রী হরগোবিন্দ পুরাতে অবস্থিত। সেখানকার অবস্থাও বাটালার অবস্থা থেকে কোন অংশে কম ভয়াবহ নয়। তৃতীয় ক্যাম্পটি কাদিয়ানে অবস্থিত। নিঃসন্দেহে মির্যাইরা এানে খুবই সন্তোষজনকভাবে মুসলমানদের সেবা করছে। এখন সহস্রাধিক শরণার্থী আহমদীদের ঘরগুলিতে লালিত পালিত হচ্ছে। কাদিয়ানে মুসলমানেরা সরকারের নিকট ত্রাণ সামগ্রীর আবেদন জানায় নি।

(জমিদার, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৪৭, খুতবাতে তাহের ৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১৮৭)

১৯৬৮ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী জনাব ভি.কে. গুপ্তা সাহেব মূখ্য মেডিকেল আধিকারিক গুরুদাসপুর কাদিয়ান যাত্রাকালে আহমদীয়া হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তাকে জানানো হয় যে সমস্ত কর্মী এবং ওষুধের ব্যয়ভার সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া বহন করে।অসুস্থদের সাধারণ চিকিৎসা বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে। এটাও বলা হয় যে জানুয়ারী ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে ডিসেম্বর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৯৭৮ জন মুসলমান এবং ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৯০ জন অমুসলমানদের এখানে চিকিৎসা করা হয়েছে। ডাক্তার ভি.কে গুপ্তা সাহেব সমস্ত বিভাগগুলির নিরীক্ষন করেন। এবং কর্মীদের মানব সেবার এই অসাধারণ সক্রিয়তা যা তারা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সুদীর্ঘ উনিশ বছর ধরে করে আসছে প্রত্যক্ষ করে প্রসন্নতা ব্যক্ত করেন। এবং ভিসিটর বুকে ইংরেজিতে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন যার অনুবাদ হল-

" হাসপাতাল পরিদর্শন করা হয়েছে। এবং এটা মুসলমান, অমুসলমান নির্বিশেষে সবার মধ্যেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করেছে। সেই দিনগুলিতে ডা. গুলাম রব্বানী সাহেব হাসপাতালের ইনচার্জরূপে সেবারত ছিলেন।

(তারিখে আহমদীয়াত, ২৮ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৬২)

২০১৬ সালে সিয়েরালিওননের জলসা সালানায় যোগদানকারী ন্যাশনাল কাউন্সিল অব প্যারামাউনট চিফস এর ডেপুটি চেয়ারম্যান নিজ বক্তব্যে জামাতের শিক্ষা, চিকিৎসা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের জন্য খুশি ব্যক্ত করেন। তিনি একজন খৃষ্টান ছিলেন, কিন্তু জলসা সালানার কল্যাণ এবং আহমদীয়াতের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে জলসার মধ্যেই তিনি মুসলমান হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। আলহামদোলিল্লাহ্ ।

অ-আহমদীদের প্রধান ইমাম বি.ও ডিসট্রিক্ট আলহাজ্জ মোস্তাফা কোকা নিজ বক্তব্যে বলেন, যে জামাতে আহদীয়া এক সুদীর্ঘ কাল যাবৎ শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই সেবা করে চলছে না, বরং দেশ এবং জাতির উন্নতি কল্পে দিনরাত তারা নিয়োজিত। জামাতে আহমদীয়ার এসব পদক্ষেপে আমি খুশি ব্যক্ত করছি।

সিয়েরালিওনের মুসলিম কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্জা প্রফেসর এ.বি. করীম নিজ মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত সিয়েরা লিওনের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে অসাধারণ সেবা করেছে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। তিনি বলেন যে, এই জলসায় খৃষ্টান এবং মুসলমানদের উপস্থিতি সিয়েরালিওন এবং জামাতে আহমদীয়ার মধ্যে ধর্মীয় সহনশীলতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

সিয়েরা লিওনের প্রেসিডেন্ট ডা. অনারেবল আর্নেস্ট বাই কোরোমা তাঁর ভাষণে বলেন, আমরা সিয়েরা লিওনে জামাত আহমদীয়া সেবাকে প্রতিটা ক্ষেত্রে সম্মান জানিয়ে থাকি। আহমদীয়া মুসলিম জামাত জনগণকে শান্তির সঙ্গে সমাজে বসবাস করা শিখিয়েছে। .....। ইসলামের বার্তা সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব এবং শুভাকাঙ্খা পোষন করার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত আমরা জামাতে আহমদীয়া দেশজুড়ে সেবা মূলক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ করি। এই অবসের আমি ইবোলো ভাইরাস আক্রমণের সময় জামাতে আহমদীয়ার সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। ... জামাতে আহমদীয়া হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরে।

(আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ই নভেম্বর, ২০১৬)

বেনিনের আমীর সাহেব লেখেন যে, নাতিটিঙ্গো এলাকার আঞ্চলিক অধিকর্তা (কমিশনার( আমাদের আমন্ত্রণে মিশন হাউসে আসেন এবং বলেন যে, বেনিনে আহমদীয়া জামাত খুবই দ্রুততার সঙ্গে উন্নতি লাভ করছে। এজন্য আমাদের মনে কিছু চিন্তার উদ্রেক হয় যে জামাতের কোন গোপন অভিসন্ধি নেই তো? তাই সরকারের পক্ষ থেকে আহমদীদের সম্পর্কে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত চালানো হয়। তারপরে আমরা জানলাম যে, জামাতে আহমদীয়া একটি শান্তিপ্রিয় জামাত যারা মানবতার সেবায় সর্বদা সম্মুখে অগ্রসরমান। জনগণ যাই বলুক, আমরা আপনাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত তাই আপনাদের আমন্ত্রণে এখানে সাক্ষাত করতে চলে এসেছি।

(আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

হাইতিতে কয়েক বছর পূর্বে ভয়াবহ এক ভূমিকম্প এসেছিল। সেই সময় জামাত বিপদগ্রস্থদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিল। ২০০৫ সালে বেনিনে অনুষ্ঠিত জলসা সালানায় অংশ গ্রহণ করে হাইতির রাষ্ট্রদূত বলেন যে, জামাতে আহমাদীয়া আমাদের খুব সেবা করে থাকে। আমরা জামাতের কর্মকাণ্ডকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি।

(আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১লা এপ্রিল, ২০১৬)

লেবার পার্টির প্রিয়াঙ্কা রাধা কৃষ্ণা বলেন, যে জিনিসটি আমি বিশেষভাবে প্রশংসা করতে চাই তা হল আপনাদের জামাতের পক্ষ থেকে শান্তির প্রসার ও সবধরণের অশান্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দৃঢ় সংকল্প ও অসাধারণ আবেগ। এবং আপনাদের মানবসেবা যার জন্য আপনারা বিশ্বে প্রচেষ্টারত তাও প্রশংসার দাবি রাখে।

Honourable Peaste Samlota liga (Minister for Ethnic communities) বলেন: আমি শান্তির সেই বার্তা সমূহেরও প্রশংসা করতে চাই যার দাবী আহমদীয়া খিলাফত করে থাকে। নিশ্চিতরূপে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সংরক্ষণে আর সংখ্যালঘু ও মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণে আপনাদের প্রয়াস প্রশংসার দাবী রাখে। নিঃসন্দেহে আহমদীয়া খিলাফত শান্তি, সমতা ও ভালবাসার শিক্ষা দান করে।

(আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২শে এপ্রিল, ২০১৬)

কেনিয়ার রেজিন কাসেমোতে 'মসজিদ মাসরূর' উদ্বোধনের শুভ অনুষ্ঠানে জনাব এডউইন আচোয়েন সাহেব প্রাক্তন চেয়ার ম্যান CDE Holo (বর্তমানে তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী মেডিক্যাল সার্ভিস এবং উক্ত এলাকা থেকে নির্বাচিত সেনেটর অনারেবল প্রফেসর আয়ুঙ্গ ইউঙ্গের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত) নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি

বক্তিগতভাবে জানি যে, জামাতে আহমদীয়া কোনরূপ ভেদাভেদ ছাড়াই মানবসেবা করে থাকে। এই এলাকাতেও জামাত ছাত্রদের সাহায্য এবং গরীব, অনাথ এবং অভাবীদের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত। জামাত এখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে বিভিন্ন কুয়ো বানিয়েছে। নলকুপও বসিয়েছে। এসব কিছুই জামাতের এই নীতিবাক্য "ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারে পরে-রই প্রতিফলন। আর আমি আশা করি যে জামাতে আহমদীয়া আগামীতে সেবার এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে।

(আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ ই আগষ্ট, ২০১৬)

বেনিনের প্রেসিডেন্ট অনারেবল থমাস ইয়ায়ি বোনী নিজের সাথী মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে পার্লামেন্ট হাউসের সভাপতির কক্ষে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন। প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন: আপনি যে সেবা করে যাচ্ছেন এটি একটি মহান কাজ। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে, দেশের উন্নয়নে আপনিও আমাদের সঙ্গে অংশীদার হয়ে আছেন।

(আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬-১ত জুন, ২০০৮)

দৈনিক পত্রিকা 'নোওয়ায়ে ওয়াক্ত লাহোর' তার ১৭ই জুন ১৯৬৯ সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠায় 'মানব সেবার অসাধারণ প্রদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখে-

রাবোয়া (সংবাদদাতা): গতকাল রাবোয়া আর চিনোটের মাঝে একটি রেল ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়ে যায় যার ফলে রেল লাইনও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে বহু ট্রেন রাবোয়া স্টেশনে আটকে পড়ে। দুপুরে কড়া রোদে রাবোয়ার ছোট ছোট বাচ্চা ও যুবকদের একটি সংগঠন সব যাত্রীদের ঠান্ডা জল ও খাবার সরবরাহ করে। উল্লেখ্য যে, মানব সেবার অসাধারণ প্রদর্শনকারী এই কিশোর ও যুবকেরা নিজেরাই ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ছিল। আর এই সেবার বিনিময়ে তারা কোন অর্থও নেয় নি আর স্বীকারও করে নি। একটি অনুমান অনুযায়ী মোট ছয় হাজার লোককে পানীয় জল ও খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

(তারিখে আহমদীয়াত, ২৫তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২)

বেনিনের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আট সদস্যের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন: দুঃস্থ ও আর্তের সেবার পাশাপাশি জামাত আহমদীয়া এবছর ঈদুল আযিহা উপলক্ষ্যে অনাথ ও গরীবদের জন্য পঞ্চাশটি বকরা প্রেরণ করেছে। একই রকমভাবে মোন এবং কোফো রাজ্যের বাসিন্দাদের জণ্য খাদ্যের সংস্থান করেছে। দাতব্য মেডিক্যাল ক্যাম্প লাগিয়ছে। তাই তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

(আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩-১৯ জুন, ২০০৮, পৃষ্ঠা: ১০)

নাইজেরিয়ার লেগোস স্টেটের গভর্নর বালগান-এর প্রতিনিধি আলহাজ্জ ইব্রাহিম সাহেব বলেন- " আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, যুগ খলীফা এখানে ইসলামিক সেন্টারের ভিত্তি রাখতে চলেছেন। এটি একটি সঠিক পদক্ষেপ এবং ইসলাম প্রচার প্রসারে সহায়ক সাব্যস্ত হবে। জামাত আহমদীয়া সমস্ত উদ্দেশ্যাবলী তা সে শিক্ষা ক্ষেত্রেই হোক বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে-সবকিছুই মানবসেবার জন্য লাভদায়ক সাব্যস্ত হচ্ছে। আমি আহমদীয়া জামাতের সকল বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২০-২৬শে জুন, ২০০৮, পৃষ্ঠা: ১১)

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের মাননীয়া সাংসদ বেরোন্স এমান ক্লিনস শতবার্ষিকি খিলাফত জুবিলীর শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন- জামাতে আহমদীয়া সারা বিশ্বে শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবতার সেবার্থে উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছে। এ কাজে যুক্তরাজ্যের সরকারও আপনাদের পাশে আছে।

(আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫-২১ শে আগস্ট, ২০০৮, পৃষ্ঠা: ২)

ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রেসিডেন্ট তাঁর বার্তায় বলেন- " একশ বছর একটি লম্বা সময় হয়ে থাকে, আর একটি জামাতে সত্য মিথ্যাকে যাচাই করার জন্য যথেষ্ট। জামাতে আহমদীয়া এই সুদীর্ঘ সময় ধরে মানবতার যা সেবা করেছে তা খুবই অনুকরণযোগ্য। .....জামাতে আহমদীয়ার মোটো 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে।'

(আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫-১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮, পৃষ্ঠা: ২)

লাইব্রেরিয়ার তথ্য ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব উইযলি মোমো জানসন লাইবেরিয়া সরকারের প্রতিনিধিত্বে ২০০৮ সালের যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় লাইবেরিয়া সরকার এবং জনসাধারণের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিয়ে বলেন- " আহমদীয়া মুসলিম মিশন লাইবেরিয়া খুবই সফলতার সঙ্গে শান্তির বার্তা সারা দেশে প্রচার করে চলেছে। লাইবেরিয়াতে শান্তি ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পাশাপাশি দারিদ্র দূরীভূত হওয়া একান্ত দরকার। আর এ ব্যাপারের সরকার এবং জনসাধারণ জামাতের পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য লাভ করছে। লাইবেরিয়া আজ জামাতে আহমদীয়া সাহায্যে ক্রমবিকাশে ধাবমান।"

(আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৮, পৃষ্ঠা: ২)

পাঞ্জাবের প্রাক্তন মন্ত্রী নথা সিং দালম গুজরাতের ভূমিকম্প পীড়িতদের জন্য উদ্ধারকারী দল রওয়া করতে গিয়ে বলেন-

" অসুস্থ, অভাবী আর আর্তের সেবা হল পৃথিবীর সর্বোত্তম মানব সেবা। পৃথিবীর সব ধর্মই মানবসেবা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি স্থাপনের শিক্ষা দান করে। শ্রী দালম আহমদীয়া জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে হয়ে চলা সমাজ কল্যাণ মূলক কর্মসূচীর প্রশংসা করে বলেন, এই জামাত দেশের সাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অসাধারণ সাহায্য প্রদান করা ছাড়াও যখনই দেশের কোথাও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে তারা প্রথমসারিতে উপস্থিত থেকে আর্ত মানবতার সেবা করেছে, এবং গুজরাতের ভূমিকম্প কবলিত মানুষদের জন্য পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করেছে। তিনি বলেন যে, মূখ্যমন্ত্রী গুজরাত ত্রাণ তহবিলে বড় অঙ্কের অর্থ সাহায্য করেছে। আহমদীয়া জামাত লন্ডন এবং অন্যান্য দেশ হতে আগত টিম গুলি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ভূজ-এ গিয়ে যে সেবা করেছে তা প্রশংসার দাবী রাখে।

(দৈনিক জাগরণ, জলন্ধর, ২৩শে মার্চ, ২০০৩)

১৯৯২ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশে সংঘটিত দাঙ্গার সময় জামাত আহমদীয়ার সেবার কথা উল্লেখ করে একটি সংবাদপত্র লেখে- দাঙ্গা বিধ্বস্ত লোকেদের সেবার উদ্দেশ্যে জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে একটি রিলিফ কমিটি গঠন করা হয়েছে যেখান থেকে বিভিন্ন ক্যাম্পগুলিতে সাহায্য প্রেরণ করা হচ্ছে। খাদ্যও পানীয়, কম্বল, প্লেট, ওষুধ ইত্যাদির জোগান দেওয়া হয়েছে। এবং এখন অব্যাহত রয়েছে। আহমদীয়া রিলিফ কমিটির পক্ষ থেকে এমন বিপুল সংখ্যক মানুষকে টিকিট কেটে দেওয়া হয় যারা একেবারে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল। ক্যাম্পের মধ্যে যে সমস্ত অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা ছিল তাদেরকে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয় এবং তাদের টাকার ব্যবস্থা করা হয়। আহমদীয়া রিলিফ কমিটি কিছু লোককে ঘর বানিয়ে দেওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং এর জন্য বিষয়টি নিরীক্ষণ করা হচ্ছে।

(দৈনিক হিন্দুস্তান উদু, ২৪ শে জানুয়ারী ১৯৯৩ হতে সংগৃহীত, বিষয়: জামাতে আহমদীয়া সমাজ সেবা, প্রকাশক: নাযারত দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ ভারত, ২০০৫)

বিশ্বব্যাপী জামাত আহমদীয়া প্রকৃত ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার ছত্রছায়ার মানব সেবার মহান কর্তব্য শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সম্পন্ন করে চলেছে। জামাত আহমদীয়ার মানব সেবা শুধু মাত্র এই নীতির উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে- إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে। (আশ-শো'রা: ১৬৫)

সেই সঙ্গে উচ্চস্বরে এই ঘোষণাও দেয়- لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

অর্থাৎ আমরা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও না। ( আল-ইনসান: ১০)

আল্লাহ্ তা'লা জামাতের সকল সদস্যকে মানব সেবার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে সেবা করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

**********

## ইমামের বাণী

**"যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমানরা কুরআন শরীফের পূর্ণানুগত্য ও অনুসরণ করবে, কোন প্রকারের উন্নতি সাধন করতে পারে না।"**

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭৯)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

# জগতবাসীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করতে জামাতে আহমদীয়ার সেবা

হিদায়াতুল্লাহ্ মাভাশী, কাদিয়ান অনুবাদ: আজিবুর রহমান, মুবাল্লিগ সিলসিলা

বর্তমান বিশ্বে চতুর্দিকে অশান্তি, অরাজকতা, অন্যায় এবং অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষ আজ বস্তুবাদিতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ব্যক্তি পর্যায় থেকে আরম্ভ করে সমগ্র জাতি পর্যন্ত সকলেই অস্থির ও উতলা হয়ে উঠেছে। সমস্ত দেশ প্রতিটি মূহুর্তে এক ভয়াবহ বিপদ আঁচ করে ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। ছোট ছোট বিবাদে এক দেশ অপর দেশের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের হুমকি দিচ্ছে। প্রত্যেক দেশ নিজের প্রতিরক্ষা এবং শত্রুদের বিনাশের উদ্দেশ্যে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরীর প্রতিযোগিতায় মেতে আছে। যার ফলে একের পর এক ধ্বংসাত্মক সমরাস্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে।

এই ভয়াবহ অবস্থায় জনগণের মনের সুখ ও শান্তি উধাও হয়ে গেছে আর তারা এক আতঙ্ক ও অস্থিরতা নিয়ে দিনাতিপাত করছে। এমন পরিস্থিতি উদ্ভবের পিছনে মূল কারণ হল খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্কহীনতা এবং মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআন শরীফ রূপে যে বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী শরীয়ত নিয়ে আবির্ভুত হয়েছিলেন সেই বার্তা থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া।

অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জগতে পূর্ণ শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা"লা প্রত্যেক যুগে পবিত্র কুরআন শেখানোর জন্য শিক্ষক রূপে মুজাদ্দিদ ও আওলিয়াগণকে আবির্ভূত করেন যাঁরা ঐশী ইলহামের মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। কুরআন ও হাদীস শরীপে ১৪ শতাব্দীতে আঁ হযরত (সা.)-এর দ্বিতীয় আগমণ হবে বলে ভবিষ্যতবাণীতে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ঐশী প্রতিশ্রুতি এবং আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর দ্বিতীয় আগমণ স্বরূপ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ (আ.) রূপে আবির্ভূত হন।

প্রতিশ্রুত মসীহ মওউদ (আ.) এর বরাতে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে তিনি 'ইউযাউল হারব' অর্থাৎ ধর্ম যুদ্ধকে রহিত করে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করবেন। সুতরাং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সম্মানীয় মুসলমান উলামাগণ, খৃষ্টান পাদ্রীগণ, হিন্দু আর্য পণ্ডিতগণকে এই বিজ্ঞাপন (ইশতেহার) পাঠাচ্ছি এবং সংবাদ দিচ্ছি যে, আমি চারিত্রিক, ধার্মিক এবং ঈমানী দুর্বলতা ও ভুলের সংশোধনের উদ্দেশ্যে জগতে এসেছি। এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর উদ্দেশ্যই হল আমার উদ্দেশ্য। এবং এই অর্থেই আমি প্রতিশ্রুতি মসীহ বলে আখ্যায়িত হয়েছি। কেননা, আমাকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, আমি যেন অলৌকিক নিদর্শন এবং পবিত্র শিক্ষার আলোকে সত্যকে জগতে ছড়িয়ে দিই। ধর্মের উদ্দেশ্যে তরবারি ধারণ করা এবং ধর্মের জন্য খোদা তা'লার বান্দাকে হত্যা করা আমি পছন্দ করি না। আমি সকল মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান এবং আর্যদের উপর একথা প্রকাশ করতে চাই যে, জগতে আমার কোন শত্রু নেই, সৃষ্টির প্রতি আমি এরূপ ভালবাসা প্রদর্শন করি, যেভাবে এক স্নেহাশীলা মা নিজ সন্তানকে ভালবাসে, এমনকি এর চেয়েও বেশি। আমি শুধুমাত্র সেই সব মিথ্যা ধর্ম-বিশ্বাসের শত্রু, যে সবের মাধ্যমে সত্যকে খুন করা হয়ে থাকে। মানব সেবা তো আমার দায়িত্ব এবং মিথ্যা, শিরক, অত্যাচার এবং সকল প্রকার কুকর্ম, অন্যায় এবং চরিত্রহীনতা থেকে অপ্রসন্নতা হল আমার রীতি।

(আরাবাঈন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা: ৩৪৩-৩৪৪)

## ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম।

ধর্মের ময়দানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যকীয় জিনিস হলো, ধর্মের ক্ষেত্রে যেন কোন বল প্রয়োগ না করা হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন: 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন।'

অর্থাৎ ধর্মে কোন বলপ্রয়োগ নেই। (সূরা আল বাকারা: ২৫৭)

আরও বলেন-

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

অর্থাৎ তুমি বল, এই সত্য তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ( প্রেরিত) সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।

(আল কাহাফ: ৩৩)

জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এই শিক্ষাও প্রদান করেছেন যে, বিগত সমস্ত নবী, রসূল, ঋষি মুনি এবং মহাপুরুষগণকে যেন সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। কেননা, প্রত্যেক জাতির মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরিত মহাপুরুষগণের আগমণ ঘটেছে।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন- وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (আর রা'দ: ৮) অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির মধ্যে পথপ্রদর্শনকারীর আগমণ ঘটেছে।

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

অর্থাৎ- এমন কোন জাতি নেই যার মধ্যে কোন নবী ও রসূলগণের আগমণ ঘটে নি।

(আল ফাতির: ২৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- ইসলাম তো সেই পবিত্র ও সংশোধনকারী ধর্ম যে, সে কোন জাতির ধর্মগুরুদের উপর আক্রমণ করে নি এবং পবিত্র কুরআন হল সেই মহাসম্মানিত গ্রন্থ যে জাতিদের মধ্যে মীমাংসার ভিত রচনা করে গিয়েছে এবং প্রত্যেক জাতির নবীকে গ্রহণ করেছে।"

(পয়গামে সুলাহ, পৃষ্ঠা: ৩০)

ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করেছে যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা এবং আদম সন্তান হওয়ার ফলেই সকলেই সমান। এইরূপে ইসলাম সকল জাতিগত এবং বংশগত বিভেদকে দূরীভুত করে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

অর্থাৎ এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকি, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা সর্বজ্ঞানী, সর্ববিদিত।

(সূরা হুজরাত, আয়াত: ১৪)

সুতরাং এই বিষয়ে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে অসাধারণ শিক্ষা জগতবাসীকে প্রদান করেছেন তা হল, কোন 'আরবীয়'-এর 'অনারব'-এর উপর কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব নেই আবার কোন অনারবেরও আরবীয়-এর উপর কোনরকম প্রধান্য নেই। না কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের চেয়ে কোন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে আবার না কোন কৃষ্ণাঙ্গের শ্বেতাঙ্গের উপর প্রধান্য রয়েছে। তোমাদের রব্বের দৃষ্টিতে তোমাদের মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার ফল। তোমাদের অভ্যন্তরে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা একটাই, আর তা হল তাক্বওয়া (খোদভীতি)। খোদা তা'লার দৃষ্টিতে বেশি ধার্মিক সে-ই যে বেশী মুত্তাকী।

(মাসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

আজ যখন জগৎ অশান্তির সাগরে ডুবে রয়েছে, চতুর্দিক হতে বিশ্বযুদ্ধের পূর্বলক্ষণ প্রকট হয়ে উঠছে। আর এখন শুধু মাত্র এই কথার প্রয়োজন রয়েছে যে, ইসলামের শান্তিপ্রিয় শিক্ষা এবং নবী করীম (সা.)-এর জীবনের সেই শেষ শিক্ষা যেন পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, জগতে সর্বদা সেসব লোকদের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাদের আগমণ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মনোনীত মহাপুরুষ রূপে হয়ে থাকে। এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর সেই শান্তি প্রিয় সোনালী শিক্ষা জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

## হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহান প্রচেষ্টা

অতএব এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.), তাঁর খলীফাগণ এবং তাঁর জামাতকে প্রেরণ করেছেন। তিনি ৮০টির বেশি পুস্তক রচনা করেছেন যেগুলিতে তিনি

(আ.) জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার শিক্ষা ও পদ্ধতি শিখিয়েছেন। আজ যদি জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে এই সব পদ্ধতি অবলম্বন করেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তিনি (আ.) জিহাদের প্রকৃত মর্মকে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং নবী করীম (সা.) -এর সুন্নতের আলোকে উপস্থাপন করার পাশাপাশি মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত জিহাদের ভুল ব্যাখ্যার অপনোদন করেছেন এবং ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটিয়ে সর্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী প্রদান করেছেন যা বাস্তবায়ন করা ছাড়া ধর্মীয় উন্মাদনার অবসান সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি বলেন-

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:- " এই যুগে অধিকাংশ পশুতুল্য মানুষেরা জিহাদের যে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করেছে তা ইসলামী জিহাদ নয় বরং তা অবাধ্য প্রবৃত্তির উত্তেজনা অথবা বেহেশত লাভের দুরাশা মাত্র যা মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে।

(গভর্নমেন্ট ইংরেজি ও জিহাদ)

তিনি বলেন: প্রকৃতপক্ষে তাদের ধারণা অনুযায়ী জিহাদের বিষয়টি সঠিক নয়। প্রথমত এটি মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের দর্শনকে হত্যা করা।

তিনি আরও বলেন- " নিজের কাজে মগ্ন বাজারের নাম না জানা একজন অপরিচিত লোককে পিস্তল দিয়ে মেরে ফেলা কি কোন পুণ্যের কাজ হতে পারে? এটাই কি ধার্মিকতা? এ যদি পুণ্যকর্ম হয়, তবে মানুষের চেয়ে জানোয়ার এ কাজে অনেক বেশি পারঙ্গম।..... খোদা তা'লা কি আমাদের অযথা কোন প্রমাণ ছাড়াই অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে অপ্রস্তুত পেয়ে টুকরো-টুকরো করতে বা গুলি করে হত্যা করতে আদেশ দিয়েছেন? নিরপরাধ, নিষ্পাপ, খোদার বাণী না পাওয়া লোককে হত্যা করা কি খোদার শেখানো ধর্ম হতে পারে? বাজারে নিজের প্রাত্যহিক কাজে ব্যস্ত একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিধবা- সন্তানদের এতীম ও ঘরকে কবরের অন্ধকার করে দেওয়া নিতান্ত পরিতাপ ও লজ্জার বিষয়। কোন হাদিস বা পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত কি এ কাজের সমর্থন করে? কোন মৌলভী কি এর জবাব দিতে পারবে? অজ্ঞরা জিহাদের নামে নিজেদের মনগড়া ভাবনার ফানুস উড়ানোর রক্তলোলুপ উন্মাদনায় মেতেছে। ..... আশ্চর্যের বিষয়, এ যুগে যখন কোন মুসলমানকে ধর্মের জন্য হত্যা করা হচ্ছে না, তখন তারা কোন অধিকারবলে নির্দোষ ব্যক্তিদের হত্যা করে?

(গভর্নমেন্ট আংরেজি অউর জিহাদ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা: ২২)

## জিহাদের ভুল ব্যাখ্যার সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়ার পরিণাম

হুযুর (আ.) কাবুলের আমীরকে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যার সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেই সঙ্গেই সেসব বিপদাবলী চিহ্নিত করে দেন যা আজ এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে আমাদের চোখের সামনে ঘটে চলেছে। অনুরূপভাবে তিনি জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য খৃষ্টান পাদ্রীদেরকে এবং খৃষ্টান নেতাদেরকে এই পরামর্শ দেন যে, তারা যেন ইনসাফের ভিত্তিতে কাজ করে এবং এধরণের প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে।

হযরত মসীহ বলেন-

"আমি অসংখ্যবার লিখেছি যে, কুরআন শরিফ কখনোই জিহাদের শিক্ষা দেয় না। মুলকথা হলো, প্রাথমিকযুগে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে এমনকি একে শেষ করে দিতে অস্ত্রধারণ করে। ফলে নিজেদের রক্ষাকল্পে (মুসলমানদের-অনুবাদক) তরবারি ধারণ করতে হয়। তাদের জন্য আদেশ ছিল, হয় ইসলাম গ্রহণ কর, নয় জীবন দাও। এ আদেশ সর্বকালের জন্য নয় বরং সে যুগের চাহিদা অনুযায়ী ছিল। নবুওয়াতের যুগের পর (খিলাফতের কালও নবুওয়াতের যুগ-অনুবাদক) নিজেদের ভুল বা খেয়াল-খুশিমত চালানো বাদশাহ্দের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ইসলাম দায়ী নয়। যে ব্যক্তি জিহাদের নামে নির্বোধ মুসলমানদের ধোঁকা দিতে চায়, তারা শুধুমাত্র তাদের অপবিত্র, বিষাক্ত বাসনাকে রূপ দেওয়ার কাজে লিপ্ত। কতইনা ভালো হতো যদি পাদ্রী সাহেবরা প্রকৃত অবস্থাকে বিবেচনায় এনে এ বিষয়ে জোর দিত যে, ইসলামে জিহাদ ও জোর করে মুসলমান বানানোর শিক্ষা নেই। সে গ্রন্থে এখনো আরও বিদ্যমান যে, " লা ইক্রাহা ফিদ্দিন"

(সুরা বাকার:২৫৬)

অর্থাৎ: ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। সেই কিতাব সম্পর্কে কি আমরা এই ধারণা পোষণ করতে পারি যে, তা জিহাদের শিক্ষা দেয়? এখানে আমি মৌলভীদের সম্বন্ধে কি আপত্তি করব- আমার আপত্তি তো এখানে পাদ্রী সাহেবদের সম্পর্কে যে, তারা বৃটিশ সরকারে জন্য উপকারী প্রকৃত সত্যপথ অনুসরণ করেনি।"

(গভর্নমেন্ট আংরেজি অউর জিহাদ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা:৩১-৩২)

এছাড়াও তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন-

" আমি মনে করি, আমাদের প্রজাহিতৈষী সরকার যেন পাদ্রীদের এসব কার্যকলাপ বন্ধ করেন। কারণ এর ফলে দেশে অশান্তি ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিচ্ছে। পাদ্রীদের এ ধরনের অতিরঞ্জিত কথায় মুসলমানরা কখনো স্বধর্ম ত্যাগ করবে না। তবে হ্যাঁ - এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যে সর্বদাই জনগণকে জিহাদের মাসলা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে বৈকি! এর ফলশ্রুতিতে তারা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে উঠবে।"

(গভর্নমেন্ট আংরেজি অউর জিহাদ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা:৯)

হুযুর (আ.) শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মীমাংসা দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তাদের উদ্দেশ্যে লেখেন-

"এহেন অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আমার মতে, তুর্কী সরকারের মত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। আর তা হল, পরীক্ষামূলকভাবে কয়েক বছরের জন্য অন্য ধর্মকে আক্রমণ করে পুস্তক প্রকাশ ও বক্তব্য দানের অধিকার বন্ধ করে দিতে হবে। তবে নিজের ধর্মের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় কোন বিধি-নিষেধ থাকবে না। এর ফলে ঘৃণার বীজ বপন বন্ধ হবে এবং পুরনো ক্ষত মুছে যাবে। জনগণ ভালোবাসা ও পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নের পথে ধাবিত হবে। জাতিতে-জাতিতে এহেন ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব দেখে সীমান্ত প্রদেশের বর্বর মানুষরাও উদ্বুদ্ধ হবে। তারাও একজন খ্রিস্টানের প্রতি এমনই ভালোবাসা রাখবে যেমন এক মুসলমান তার ভাইয়ের প্রতি রাখে।"

(গভর্নমেন্ট আংরেজি অউর জিহাদ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা:৩১-৩২)

আক্ষেপের বিষয় হল এই যে, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সামাজিক শান্তি ও সমন্বয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে যুগ সংস্কারক ও ন্যায় বিচারক হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর দূরদর্শী ও মূল্যবান পরামর্শ মেনে চলার সৌভাগ্য কারো হয় নি। ফলশ্রুতিতে আজ শত বছর পরেও সন্ত্রাসের ঘটনাবলী নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্ব অশান্তি ও অরাজকতার এক জটিল দুর্বিপাকে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

## রাব্বুল আলামীনের বৈশিষ্ট্য

শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি (আ.) জগতের সামনে খোদা তা'লার রাব্বুল আলামীন বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু প্রতিপালকের বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ যেভাবে আমাদের প্রভু প্রতিপালক তাঁর মান্যকারী এবং অস্বীকারকারী উভয়ের প্রতিই একই রকম আচরণ করেছেন। অতএব, আমাদের উচিত জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেককে মানুষ এবং আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তাদের সঙ্গে ভালবাসা ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" আমাদের রীতি হল সকল সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। যদি কেউ দেখে যে, তার প্রতিবেশী হিন্দুর বাড়িতে আগুন লেগেছে আর সে আগুন নিভাতে তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না তাহলে আমি সত্য সত্য বলছি যে, সে আমার জামাতভুক্ত নয়। যদি আমার জামাতের কোন সদস্য দেখে যে, কেউ কোন এক খৃষ্টানকে হত্যা করছে আর যদি সে তাকে উদ্ধারের জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত না করে তবে আমি তোমাদেরকে সত্যিই বলছি যে, সে আমার জামাতভুক্ত নয়। আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি যে,কোন জাতির সঙ্গে আমার কোন প্রকার শত্রুতা নেই। হ্যাঁ যথাসম্ভব তাদের ধর্ম বিশ্বাসের সংশোধন করতে চাই। এবং কেউ যদি কেউ গালি দেয় তাহলে আমাদের অভিযোগ খোদা তা'লার দরবারে হবে, কোন জাগতিক আদালতে নয়। এবং জাতি বৈষম্যের উর্দ্ধে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা তো আমার কর্তব্য। "

(সীরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২ পৃষ্ঠা: ২৮)

সকল নেতা এবং ধর্মীয় মনিষিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) শান্তি প্রতিষ্ঠার আরেকটি পদ্ধতি উপস্থাপন করে বলেন, প্রত্যেক জাতির মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার মনোনিত মহাপুরুষগণের আগমণ ঘটেছে। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। এই পদ্ধতিতে তিনি (আ.) আন্তর্জাতিক ঐক্য স্থাপনের ক্ষেত্রে এক সুদৃঢ় ভিত রচনা করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

হে প্রিয় বন্ধুগণ! চিরকালের অভিজ্ঞতা ও বারবারের পরীক্ষা একথা প্রমাণ করে দিয়েছে,বিভিন্ন জাতির নবী ও রসূলগণকে অবমাননার সাথে স্মরণ করা ও তাঁদেরকে গালি দেওয়া এরূপ এক বিষ, যা পরিণামে কেবল দেহকেই ধ্বংস করে না বরং আত্মাকেও ধ্বংস করে মানুষের ইহকাল ও পরকালকে বিনষ্ট করে দেয়। সেই দেশ শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারে না, যার অধিবাসীরা একে অপরের ধর্মের পথ প্রদর্শকগণের দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং তাঁদের সম্মানহীনতার কাজে লিপ্ত থাকে। সেই সকল জাতিতে কখনো সত্যিকারের একতা আসতে পারে না, যাদের মধ্যে এক জাতি বা উভয় জাতি একে অপরের নবী, ঋষি এবং অবতারগণের নিন্দা ও দুর্নাম করতে থাকে।

(পয়গামে সূলাহ, রূহানী খাযায়েন, ২৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৫২)

বর্তমান যুগের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সামাজিক শান্তি ও সুস্থিতিতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী গতিবিধির মধ্যে অধিকাংশ গতিবিধিই হল ধর্মীয় ঘটনাবলী এবং অতীতের কোন অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরে, সেটি সত্য নির্ভর হোক বা বানানো হোক, পুস্তক আকারে বা সংবাদপত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করে জাতিসমূহের মধ্যে শত্রুতা তৈরী করা। এইভাবে পুরোনো বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে পারস্পরিক মনোমালিন্য ও শত্রুতার বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অথচ বিগত জুলুম ও অত্যাচারের অধ্যায় এবং সেই সব অত্যাচারীরা উভয়েই অতীতের গর্ভে সমাধিত হয়েছে। যুগ ও পরিস্থিতি উভয়ই বদলে গিয়েছে। বর্তমান যুগের বংশধর এবং মানুষের সঙ্গে সেই সব অত্যাচারের কোন সম্পর্ক নেই।

এ বিষয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) পবিত্র কুরআনের আলোকে জগতবাসীকে ভালবাসা, একতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে শিক্ষা প্রদান করেছেন তা হল-

তিনি বলেন- " আমি অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে লিখতে চাই যে, ইসলামী রাজত্বের সময় শিখ ভাইদের সাথে ইসলামী শাসকগণের সঙ্গে যা কিছু ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল বস্তুত তা সবই ছিল জাগতিক দিক। কুপ্রবৃত্তির কারণে এগুলি বৃদ্ধি পেয়েছিল আর জাগতিক মোহ এমন পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদকে উৎসাহিত করেছিল, কিন্তু জগতপূজারীরা কোন আক্ষেপ করে না। ইতিহাস থেকে এমন অনেক সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক ধর্মের মানুষের মাঝে এই উদাহরণ বিদ্যমান যেখানে নিজেদের রাজত্বকালে এক ভাই অপর ভাইকে এবং পুত্র পিতাকে হত্যা করেছে। এমন লোকদের ইহকাল ও পরকালের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।..... প্রত্যেক গোত্রের পুণ্যবান ও সাধু লোকদের উচিত স্বার্থলোভী রাজা -বাদশাহদের কেচ্ছা কাহিনীকে মাঝখানে এনে তাদের সেই হিংসা বিদ্বেষের শরিক না হওয়া যা কেবল তাদের প্রবৃত্তির বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ছিল। তারা এক ভিন্ন জাতি ছিল যারা গত হয়ে গেছে। তাদের কর্ম তাদের জন্য আর আমাদের কর্ম আমাদের জন্য। আমাদের ক্ষেতে তাদের বীজ বপন করা উচিত নয়। আমাদের পূর্ববর্তী জাতির কৃতকর্মের কারণে আমরা যেন নিজেদের অন্তরকে মলিন হতে না দিই।

(সত বচন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা: ২৫২)

এই সোনালী নীতির মাধ্যমে হযরত মসীহে মওউদ (আ.) কিয়ামত পর্যন্ত এই অত্যাচার, নৈরাজ্য ও কলহের অবসান ঘটিয়েছেন যা বংশানুক্রমিকভাবে চলতে থাকে আর মানুষকে অকারণে পাপের দিকে ঠেলে দেয়। আর শহরের অলিতে গলিতে পানির মত মানুষের রক্ত বইতে থাকে। আর মানুষ তখন শয়তানের রূপ ধারণ করে বর্বরতার উলঙ্গ নাচ দেখায়।

এই মূল্যবান নীতির অধীনে আবশ্যিকভাবে মেনে চলার বিষয় হল অতীতের বাদশাহ বা জাতির অন্যায় অত্যাচারে কাহিনী তুলে পরিবেশকে কলুষিত না করা। তারা যা কিছু করেছে তার প্রতিফল নিজেরাই ভোগ করছে। সেগুলির পুনরাবৃত্তি করার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের নিজেদের কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। আমরা যদি নিজেদের মধ্যে শান্তি, ঐক্য এবং উদারতা সৃষ্টি করি তাহলে তার সুমিষ্ট ফল আমরা নিজেরাই ভোগ করব।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই শান্তিপূর্ণ নীতি ও শিক্ষাই পবিত্র কুরআন এবং বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর পবিত্র আদর্শের আলোকে জগতের সামনে তুলে ধরেছেন। এই পথে তাঁর গোটা জীবনটাই উৎসর্গিত ছিল। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ১৯০৮ সালে মৃত্যুর মাত্র এক দিন পূর্বে নিজের বিখ্যাত লেকচার 'পয়গামে সুলাহ' বা শান্তির বার্তা রচনা করেন। যেখানে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এমন মূল্যবান নীতি ও উপদেশাবলী বর্ণনা করেন যা জাতিসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও একতা সৃষ্টির জন্য আবশ্যকীয়।

অতএব আজ আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব বোধের এটিই একমাত্র পথ। আজ যদি জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে একমাত্র এই শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন যে, এখন যেখানে আধ্যাত্মিক উন্নতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে সেখানে জাগতিক শান্তি প্রতিষ্ঠাও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেননা তিনিই আঁ হযরত (সা.) আদেশবলী পরিপূর্ণরূপে পালন করেছেন। জগতকে ভালবাসা এবং সংশোধনের দিকে আহ্বান জানিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করার উপদেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করে আল্লাহ্ তা'লার আলোতে আলোকিত করে তুলেছেন এবং স্বয়ং নিজেও জগতের জন্য শান্তির মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

আঁ হযরত (সা.) উক্তি ছিল যে, 'ইউযাউল হারব' অর্থাৎ যখন মসীহ আসবে তখন সে এসে ধর্মযুদ্ধকে রহিত করবে। এই 'ইউযায়ুল হারব'-এর কারণে পুনরায় শান্তির বার্তাও ছড়িয়ে পড়বে এবং তাঁর শিক্ষার আলোকেই, আঁ হযরত (সা.)-এর উপদেশাবলীর আলোকেই চিরস্থায়ী খিলাফত ব্যবস্থাপনা তা পুনরায় এগিয়ে নিয়ে যাবে। আজ মুসলমান উলামাগণও যদি এই মহত্বকে বুঝে নেয়, আমাদের অন্যান্য মুসলমান ভাইয়েরাও যদি এই মহত্বকে বুঝে নেয় তাহলে পাশ্চাত্যে যে প্রতিনিয়ত ইসলামের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং কোন না কোন অসন্তোষ সংঘটিত হয়, তাহলে তারা সেসব করারও সুযোগ পাবে না। একতার মধ্যেই শক্তি নিহিত এবং তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন। "

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০০৯, প্রকাশিত আল ফযর ২৫ শে ডিসেম্বর, ২০০৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেই সব নীতি ও শিক্ষা জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন যার মাধ্যমে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং যার মাধ্যমে জগত এক ভয়াবহ ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারে। তাঁর তিরোধানের পর জামাতে আহমদীয়ার খলীফাগণ সেই লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে বিশ্বে এক অসাধারণ পরিবর্তন সাধন করেছেন। এবং আজ এই জামাত মানবতাকে রক্ষার্থে পৃথিবীর সর্বত্র চেষ্টারত আছে।

হযরত মৌলানা হাফেয হাকিম নুরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) বলেন-

" যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজ সৃষ্টির প্রতি করুণা বর্ষন করে থাকেন এবং দয়া ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখেন, তোমরাও তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রকৃত ভালবাসা ও প্রকৃত দয়ার আচরণ কর। এবং একে অপরের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের আচরণ কর।..... খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে অধার্মিক এবং (তাঁর প্রতি) উদাসীন ব্যাক্তিরাও তাঁর প্রতিপালন থেকে

জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যকে ২০১৭ সালের কাদিয়ান জলসা সালানার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

দোয়াপ্রার্থী:

নূর জাহান বেগম, জামাত আহমদীয়া কোলকাতা

উপকৃত হয় এবং অংশ পেয়ে থাকে। অতএব তোমরা খোদার সৃষ্টির প্রতি কৃপা, পুণ্য এবং সদাচার করার ক্ষেত্রে কেবল মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকো না, বরং এর উর্দ্ধে এসে সমগ্র মানবজাতির উপর যথাসাধ্য দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। খোদা তো জগতের প্রভু। এরাও যেন সমগ্র জগতের জন্য দয়ালু হয়। অতএব এটিই তাকওয়া। ”

(খুতবাতে নূর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে বলেন-

“ জগতের কাজ শান্তির উপর নির্ভরশীল। যদি শান্তি না থাকে তাহলে কোন কাজই সঠিকভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। যত শান্তি হবে ইসলাম ততই উন্নতি লাভ করবে। এই কারণেই আমাদের নবী করীম (সা.) সব সময় শান্তির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ..... তিনি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, কিভাবে অমুসলিম রাজত্বে জীবনযাপন করা উচিত। সেই জীবনযাপনের আবশ্যিক কর্তব্যাবলী পালনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি শান্তি না থাকে তবে আমরা কোন কাজই সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হব না। এই জন্য আমি উপদেশ দিচ্ছি যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কর। এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তির প্রয়োজন রয়েছে আর তা সরকারের কাছে আছে। আমি তোষামোদ করছি না বরং সত্যকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বলছি যে, তোমরা শান্তিপ্রিয় জামাত হও যাতে তোমাদের উন্নতি হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পার। এর পুরস্কার সৃষ্টির কাছে চেয়ো না বরং আল্লাহ্ তা'লার কাছে চাও। এবং স্মরণ রেখ! শান্তি ছাড়া কোন ধর্মই উন্নতি সাধন করতে পারে না আর ফুলে-ফলে সুশোভিত হতে পারে না। আমি একথাও বলব যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী থেকে জানা যায় যে, সরকারের এই অনুগ্রহের বিনিময়ে যদি আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর প্রতিদান অবশ্যই দিবেন আর আমরা যদি এর বিরুদ্ধাচরণ করি তবে তার অশুভ পরিণামের জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।”

(হাকায়েকুল ফুরকান, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৫৩-৪৫৪)

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বলেন:

“ অতএব ইসলাম একথা বলে যে, চারটি জিনিস ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ লীগের কাছে সৈন্য শক্তি থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ সুবিচারের সাথে একে অপরের মধ্যে মীমাংসা করা উচিত। তৃতীয়তঃ যে অমান্য করবে তার বিরুদ্ধে সবাই একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করা এবং চতুর্থতঃ মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর মীমাংসাকারীরা যেন ব্যক্তিগতভাবে কোন স্বার্থ লাভ না করে।

লীগ অফ নেশনস-এর চারটি নীতির কথা কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এইসবকে বাস্তবায়ন করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। প্রথম লীগ অফ নেশনসও ব্যর্থ হয়েছে এবং দ্বিতীয় লীগ অফ নেশনসও ব্যর্থ হয়েছে। অতএব বিশ্বের এখন ইসলামী নীতি অবলম্বন করার এবং এটিকে বাস্তবায়িত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কেননা যতদিন এই দলতন্ত্র এবং জাতি বৈষম্য বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এক অলীক স্বপ্নের মতই থেকে যাবে। অতএব এই বৈষম্য ও ভেদাভেদকে আমাদের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। যতদিন এই ভেদাভেদ অবশিষ্ট থাকবে ততদিন পৃথিবীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে না। অতএব লীগ অফ নেশনস তখনই উন্নতি লাভ করতে পারবে যখন সে ইসলামী পদ্ধতিতে গড়ে উঠবে এবং ইসলামী শিক্ষা অনুসারে কাজ করবে। লীগ অফ নেশনসের পর যদি জগৎ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহালে তাকে নিম্ন লিখিত চারটি জিনিসকে একত্রিত করতে হবে। যদি এই সব জিনিসকে একত্রিত করে নেওয়া হয় তাহলে তা পৃথিবীতে একক রাজত্ব স্থাপনের সমতুল্য হয়ে উঠতে পারে।

১) কয়েন এবং এক্সচেঞ্জ
২) বানিজ্যিক সম্পর্ক
৩) আন্তর্জাতিক আদালত এবং
৪) যাতায়াত মাধ্যম।

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ যেন সফরের সুযোগ পায় এবং সে স্বাধীনভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফর করতে পারে।

এইসব জিনিস লীগ অফ নেশনসের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা লীগ অফ নেশনসের প্রয়োজন পড়ে কোন কোন সময়; কিন্তু সফর ও ব্যবসা বানিজ্যে সম্পর্ক তো প্রতিদিনের বিষয়। এখন এমনও কিছু দেশ আছে যারা এই সব কানুন তৈরী করে নিয়েছে যে, অন্য কোন দেশের মানুষ যেন তাদের দেশে প্রবেশ করতে না পারে। উদাহরণ স্বরূপ রাশিয়া এবং আরও কয়েকটি দেশ নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে রেখেছে যে, কোন অন্য দেশের বাসিন্দা যেন তাদের দেশে প্রবেশ করতে না পারে। আমরা সেখানে মুবাল্লিগ পাঠানোর উদ্দেশ্যে পাসপোর্ট সংগ্রহ করার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারি নি। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না পারস্পরিক মত বিনিময়ের অনুমতি দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব নয়। কেননা, দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য মানুষের মধ্যে ঐক্য থাকা একান্ত জরুরী। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না মত বিনিময় না হয় মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। এই কারণে দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য পারস্পরিক মত বিনিময় হল প্রথম পদক্ষেপ। অতএব এই চারটি বিষয়কে যদি একত্রিত করে দেওয়া হয় তবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অতঃপর দেশের আভ্যন্তরীণ কলহ বিবাদ দূরীভূত করার জন্য ইসলাম কয়েকটি নিয়ম কানুন নির্ধারণ করেছে। সেগুলি উপস্থাপন করছি। প্রথম জিনিস হল জাতিভেদ দূর করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন - হে লোক সকল আমরা তোমাদেরকে নর ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন দল ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। কিন্তু স্মরণ রেখো! তোমাদের মধ্যে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী। জাতি, গোত্র ও বংশ তো একে অপরকে চেনার জন্য তৈরী করা হয়েছে। যেভাবে সনাক্ত করার জন্য নাম রাখা হয়। কিন্তু তোমরা নামের জন্য কি কখনো একথা ভাবো যে, যেহেতু অমুকের নাম আব্দুল্লাহ্ এই জন্য সে ছোট আর অমুকের নাম যেহেতু রহীম তাই সে বড়? বরং এই সব নাম তো একে অপরকে সনাক্ত করার জন্য রাখা হয়। কিন্তু কিছু কিছু লোক অজ্ঞতাবশতঃ নিজেদেরকে অপরের চেয়ে বেশি সম্মানিত বলে মনে করে। উদাহরণ স্বরূপ মুসলমানদের মধ্যে সৈয়্যদ এবং হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সাধারণত নিজেদেরকে বেশি সম্মানিত বলে মনে করে। অতএব এই যে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করা হওয়া, এটি নিজেদের মধ্যে কোন সম্মানের দাবি করে না, বরং এটি তো একে অপররকে চেনার জন্য করা হয়েছে। যদি সবারই নাম আব্দুল্লাহ্ হত বা সবাই যদি চুনিলাল ও রামলাল হতো তাহলে একে অপরকে সনাক্ত করাটা খুবই জটিল হয়ে পড়ত। এইজন্য এইসব নাম, গোত্র এবং দেশ ইত্যাদি আমাদের চেনার জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে করা হয়েছে। অন্যথায় ইসলাম কাউকে শুধু মাত্র গোত্র, বংশ বা দেশের জন্য একে অপরের চেয়ে সম্মানিত বলে আখ্যায়িত করে না।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এক হাদীসে বলেন যে কোন আরব বাসী অনারবদের উপর কোন ধরণের শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না আর কোন অনারবও আরবদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা।

দ্বিতীয়ত, বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মধ্যে ভেদাভেদ মুছে ফেলা হোক। সাধারণ দেখা যায় যে, মানুষ কেবল নিজের বন্ধুদের সাহায্য করে থাকে এবং যাদের সাথে তাদের কোন মতভেদ থাকে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। এই নীতি শান্তি ভঙ্গ করে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, আমি তোমাদেরকে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করছি না। তোমরা বন্ধুদের সাহায্য অবশ্যই কর, কিন্তু তা যেন পুণ্য ও তাকওয়ার গণ্ডীর মধ্যে থেকে। তার প্রাপ্য অধিকার তাকে প্রদান কর। বন্ধু বলে অবাধ্যতা ও পাপে লিপ্ত থাকা অবস্থাতেও যেন তার সাহায্য করা না হয়। নবী করীম (সা.) একবার সাহাবাগণকে বলেন যে, اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا অর্থাৎ তোমরা নিজ ভাইয়েদের সাহায্য কর সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারীত হোক। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! অত্যাচারীতদের সাহায্য করার কথা তো বুঝতে পারলাম, কিন্তু অত্যাচারীদের কি করে সাহায্য করব? তিনি বলেন, তাকে অত্যাচার করা থেকে বাধা দাও। এটিই তার জন্য সাহায্য। মোটকথা যেভাবে হোক না কেন নিজ ভাইয়েদের সাহায্য করা তোমাদের

কর্তব্য। যদি সে অত্যাচারীত হয়ে থাকে তাহলে অত্যাচারীকে বাধা দাও আর যদি সে নিজেই অত্যাচারী হয়ে থাকে তাহলে তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখ। অতএব বৈধ্য সাহায্যের জন্য ইসলাম আদেশ প্রদান করে, কিন্তু অবৈধ সাহায্যকে কঠোরভাবে নিষেধ করে এবং এই আদেশ প্রদান করে যে, আনন্দের নেশায় যেন সমস্ত অবৈধ বিষয়কে স্বীকার না কর।

তৃতীয় কথা হলো, ধনী ও দরিদ্রের ভেদাভেদ যেন মুছে ফেলা হয়। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, শহরবাসীর ধনসম্পদ যা আল্লাহ্ তা'লা নিজ রসূলকে প্রদান করেন তা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং নিকট আত্মীয়দের জন্য হয়ে থাকে এবং এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য হয়ে থাকে। এবং আমি এই কানুন এই জন্য তৈরী করেছি যেন এই ধনসম্পদ তোমাদের ধনীদের মধ্যে ঘুরপাক না খায়। বরং দরিদ্রের যেন খেয়াল রাখা হয়। হ্যাঁ ইসলাম একথা বলে না যে, ধনীদের কাছ থেকে সমস্ত সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যে কোন উপায়ে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হোক। বরং ব্যক্তি স্বাধীনতাও প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই দেশীয় ব্যবস্থাপনাকেও এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, নিজেদের ধনসম্পদ এমনভাবে ব্যয় কর যাতে দরিদ্রদের উন্নতি হয়।

চতুর্থ কথা হল, জাতিবাদ বা পক্ষপাতিত্বের মানসিকতা দূরীভূত হওয়া উচিত। জগতের অধিকাংশ মানুষ এমন যারা শুধু এতটুকু বোঝে যে, যেহেতু আমাদের জাতি এই কথা বলে তাই সেটিই ঠিক আর আমাদের জাতির প্রত্যেকটি কথাকে সত্য প্রতিপন্ন করাই এখন আমাদের কর্তব্য। তারা এটি দেখে না যে জাতি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে না কি মিথ্যার উপর। আর জাতিও মানুষের কাছে প্রত্যাশা রাখে যে, যে কোন পরিস্থিতিতে জাতির মানুষ সাহায্য করবে তাই বৈধ অবৈধ সকল প্রকারের কাজকর্মকে আইনসম্মত মনে করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন হে মোমিনগণ! তোমরা বিশেষ বিষয়াদিতে পরামর্শ বৈঠক কর। এবং সর্বদা এই পন্থাকে নিজেদের সামনে রেখো যে, তোমরা কোনভাবেই পাপ অত্যাচারে লিপ্ত হবে না এবং নিজেদের রসূলের অবাধ্য হবে না এবং এই সব বিষয়াদিতে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। ইসলাম এমন ধরনের দলকে অবৈধ আখ্যায়িত করে যারা পাপ, অত্যাচার এবং রসূলের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে না। তবে ইসলাম একথা অবশ্যই বলে যে, এ ধরণের কমিটি গঠন কর যা পুণ্যকর্ম এবং তাকওয়ার ভিত্তিতে কাজ করবে। আর নিজেদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি কর। এবং তাঁর সীমারেখাকে উলঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাক। কেননা, তোমাদের এই সব দল এই পৃথিবীতেই রয়ে যাবে। তোমরা সাময়িকভাবে এই পরীক্ষার ঘরে এসেছ, কিন্তু তোমাদের মুক্তি পরকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অতএব এ ধরণের কর্ম থেকে বিরত থাক যা তোমাদের ভবিষ্যত জীবনকে বিনষ্ট করে দিবে। এই হল সেই চারটি নীতি যা ইসলাম উপস্থাপন করেছে। যদি জগতবাসীরা এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে বর্তমান যুগে বিরাজমান অশান্তি থেকে মুক্ত হতে পারবে। "

( আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮,পৃষ্ঠা: ৪৩২-৪৩৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহ.)-এর খিলাফত কালের ব্যপ্তি ছিল ১৯৬৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৮২ সালের জুন পর্যন্ত। এটি ছিল সেই যুগ যখন পৃথিবী দুই বিশ্বযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই জাতি বিদ্বেষের যুগে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তৃতীয় ইমাম জগতে শান্তির শিক্ষায় পরিপূর্ণ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন যার মধ্যে ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব বোধের এক মহান বার্তা ছিল। এক স্থানে তিনি বলেন-

" আমি জীবনে শতাধিক বার কুরআন করীমকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছি। এর মধ্যে একটিও এমন আয়াত নেই যা জাগতিক বিষয়াদিতে এক মুসলমান ও মুসলিমদের মধ্যে বৈষম্যের শিক্ষা দেয়। ইসলামি শরীয়ত সৃষ্টির প্রতি এক পরিপূর্ণ রহমত স্বরূপ। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ মানুষের হৃদয়ে ভালবাসা ও সহানুভুতির মাধ্যমে জয় করেছিলেন। আমরাও যদি মানুষের হৃদয়কে জয় করতে চাই তাহলে আমাদেরকেও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সারাংশ হল- ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নহে কারো পরে Love for all hatred for none. এই পদ্ধতিতেই আমাদেরকে মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে। এটি ছাড়া আর কোন পথ নেই। "

( ১৯৮০ সালে জলসা সালানা যুক্তরাজ্য উপলক্ষ্যে বক্তব্য)

এছাড়াও হুযর (রহ.) লন্ডন, গোটা ইউরোপ এমনকি গোটা বিশ্বের জাতিদেরকে শান্তির বার্তা এবং তৃতীয় ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

তিনি বলেন-

" আপনারা অবগত আছেন যে, আমি ইউরোপের সফরে গিয়েছিলাম, লন্ডনের ওয়ান্ড যোর্থ হলে আমি ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলাম, যেখানে ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের বাসিন্দা এমনকি গোটা বিশ্বের জাতিদেরকে সম্বোধন করে তাদেরকে এদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম যে, যদি তারা নিজ প্রভু প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে এবং যদি তারা হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সা.)-এর পতাকা তলে একত্রিত না হয় তাহলে এক ভয়ানক বিপদ তাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে যা কিয়ামতের নিদর্শন স্বরূপ হবে।

(খুতবাতে নাসের, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৩০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) শান্তি ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সম্পর্কে সতর্ক করে যে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেছিলেন সেখানে তিনি বলেন যে, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম হিসেবে আমি এক আধ্যাত্মিক পদ মর্যাদায় আসীন হওয়ার বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়েছি। এর সুবাদে আমার উপর যেসব দায়িত্ব অর্পিত হয় শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি সেগুলিকে উপেক্ষা করতে পারি না। আমার সেইসব দায়িত্বাবলীর সীমা সমগ্র মানব জাতি পর্যন্ত বিস্তৃত আর আমি এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনের দিক থেকে সকল মানুষকে ভালবাসি। "

(খুতবাতে নাসের, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৩০-৯৩৫)

সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ! বর্তমানে মানবতা এক ভয়ানক ধ্বংসের গহ্বরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। এই সম্পর্কে আপনাদের এবং আপনাদের ভাইদের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ বার্তা নিয়ে এসেছি। সুযোগ অনুসারে সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। আমার এই বার্তা শান্তি, সমন্বয় এবং মানবতার জন্য এক আশার বাণী। আমি আশা করি যে, আপনারা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুনবেন এবং এক পবিত্র ও উদার হৃদয় নিয়ে এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন।

(খুতবাতে নাসের, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৩০)

এরপর হুযুর (রহ) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সংক্ষিপ্ত জীবনি তুলে ধরার পর তাঁর দাবি ও আগমণ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বলেন- হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দুটি বিশ্ব যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যেগুলি পূর্ণতা লাভ করেছে, সেখানে তিনি (আ.) তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সুতরাং হুযুর রহ. বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেটি বিগত দুই বিশ্ব যুদ্ধের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক হবে। দুপক্ষই এমনভাবে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ করবে যে, মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়বে। আকাশ থেকে মৃত্যু ও ধ্বংস বর্ষিত হবে এবং এক লেলিহান আগুনের শিখা সমগ্র পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। আধুনিক সভ্যতার বিশাল অট্টালিকা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। উভয়পক্ষেরই যোদ্ধারা অর্থাৎ রাশিয়া ও তার মিত্র শক্তি এবং মার্কিন দেশ ও তার মিত্র শক্তিরা উভয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের ব্যবস্থাপনা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। জীবিতরা হতবুদ্ধি ও বাকহারা হয়ে পড়বে। রাশিয়ার বাসিন্দারা তুলনামূলক ভাবে এই ধ্বংস থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসবে এবং স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, সেই দেশের জনসংখ্যা অতি দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে এবং তারা প্রভু প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাদের মধ্যে ব্যাপকহারে ইসলামের প্রসার ঘটবে। এবং সেই সব জাতি যারা পৃথিবী থেকে খোদার নাম এবং আকাশ থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আস্ফালন করত সেই তারাই নিজেদের পথভ্রষ্টতাকে জেনে যাবে। এবং ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।"

(খুতবাতে নাসের, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৩০-৯৩৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ) বলেন, ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক

তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এড়ানোও সম্ভব, যদি মানুষ তার প্রভু প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং অনুশোচনা করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) বলেন-

" একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামের বিজয় এবং সূর্য উদয়ের লক্ষণাবলী প্রকাশ পাচ্ছে। যদিও এখন তা অস্পষ্ট, তথাপি তা দেখা যেতে পারে। ইসলামের সূর্য অতি উজ্জ্বলতার সঙ্গে উদিত হবে এবং জগতকে আলোকিত করে তুলবে। কিন্তু এই সব হওয়ার পূর্বে জগতকে এক বিশ্বব্যাপী ধ্বংস লীলার সম্মুখীন হওয়া আবশ্যক। এমন এক রক্তক্ষয়ী বিপদ যা মানুষকে বিস্ময় বিহ্বল করে তুলবে। কিন্তু একথা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এটি একটি সতর্কতামূলক ভবিষ্যদ্বাণী আর সর্তকতামূলক ভবিষ্যদ্বাণী পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব। এমনকি এটি মুলতবীও হয়ে যেতে পারে যদি মানুষ তার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এবং জীবন যাপনের পদ্ধতি সঠিক করে নেয়। তারা এখনও খোদা তা'লার শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে যদি তারা ধনসম্পদ, শক্তি ও বড়ত্বের মিথ্যা খোদার উপাসনা পরিত্যাগ করে নিজ প্রভুর সাথে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তুলে অন্যায় আচরণ থেকে বিরত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার এবং তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদান করতে আরম্ভ করে এবং জনগণের প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করতে লাগে। যে সব জাতি বর্তমানে শক্তি, সম্পদ এবং জাতিগত দিক থেকে বড়ত্বের নেশায় মত্ত রয়েছে, তারা সেই সব বর্জন করে আধ্যাত্মিক আনন্দ এবং স্বাদ পেতে ইচ্ছুক কি না তা তাদের উপর নির্ভর করছে। যদি জগতবাসীরা জাগতিক আনন্দ উল্লাস পরিহার না করে তাহলে এই সতর্কতামূলক ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই পূর্ণ হবে। এবং বিশ্বের কোন পরাশক্তি এবং কোন কল্পিত খোদা জগতকে বর্তমান যুগের ভয়ানক বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অতএব নিজেদের উপর এবং নিজ বংশধরদের উপর দয়া করুন এবং দয়ালু খোদার ডাকে সাড়া দিন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের উপর কৃপা করুন এবং সদকা খয়রাত কবুল করুন এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

(খুতবাতে নাসের, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৩০-৯৩৫)

জামাতের আহমদীয়ার চতুর্থ ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহ) জামাত আহমদীয়াকে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মানবতাকে রক্ষা করা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছেন। তিনি (রহ.) বলেন-

"জামাত আহমদীয়ার কর্তব্য হল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষার আলোকে জগতের রাজনীতিকে আলোকিত করে তোলা। আহমদীরা যে দেশেই বাস করুক তারা যেন এক জিহাদ বা সংগ্রাম শুরু করে দেয়। তাদেরকে বলুন যে, তোমাদের শেষ বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে, যাবতীয় বিপদাবলীর মূল হল অবিচার এবং স্বার্থপরতা। বিশ্বে জাতিদের কাছে যতই নিত্য নতুন প্রতিশ্রুতি দিক না কেন, যত ধরণের নকশা তৈরী করুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী ন্যায় নীতির আশ্রয় নিবে, হযরত মহম্মদ (সা.)-এর চারিত্রিক সৌন্দর্যের আশ্রয়ে আসবে যিনি জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন। এই জন্যই শুধু মাত্র তাঁর শিক্ষাই মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে। বাকি সমস্ত বিষয়াদি বিভ্রম, রাজনীতির কলহ ও কুটনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব সার্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আজ একমাত্র আহমদীয়াই সঠিক পথে এক বিশ্ব ব্যাপী জিহাদ বা সংগ্রামের ভিত রচনা করেছে। অতএব আমি আপনাদের সকলকে বিশ্বব্যাপী পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে এবং রাজনীতিকে ন্যায় নীতির সঙ্গে পরিচিত করতে এক জিহাদ আরম্ভ করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। "

(মসজিদ ফযল লন্ডন হতে ১৬ ই নভেম্বর, ১৯৯০ সালে প্রদত্ত জুমআর খুতবা )

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করার জন্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে রত রয়েছেন। তিনি জগতবাসীকে এইসব বিপদাপদ থেকে অবহিত করছেন যা এক ভয়ানক অজগরের ন্যায় মানুষকে গিলে খাওয়ার জন্য মুখ খুলে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে যেখানে তিনি নিজ খুতবা ও খিতাবের মাধ্যমে তাদেরকে সর্তক করে চলেছেন, অপরদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ইসলামের শান্তিপ্রিয় শিক্ষাকে পৌঁছে দিচ্ছেন। যেন মানুষ কোন ভাবে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়ানক বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বারংবার এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে, যদি জগতবাসীরা এদিকে দৃষ্টি না দেয় তাহলে অচিরেই তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটবে। কেননা বর্তমান যুগের পরিস্থিতি এমন যেন গোটা বিশ্ব এক বারুদের স্তুপে বসে রয়েছে। সারা বিশ্বে ভ্রমণ করে হুযুর আনোয়ার (আই.) যে সব অমূল্য বক্তব্য প্রদান করেছেন তার মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করছি।

(১) হুযুর আনোয়ার (আই.) ২২ শে অক্টোবর ২০০৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে হাউসের হাউস অফ কমনস্ এ একটি বক্তব্য প্রদান করেন। (২) হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১২ সালে জার্মানীর মিলিটারী হেড কোয়ার্টারে একটি বক্তব্য প্রদান করেন। (৩) হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১২ সালে ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটাল হিলসে একটি বক্তব্য প্রদান করেন। (৪) হুযুর আনোয়ার (আই.) লন্ডনে ৯ম শান্তি সম্মেলনে একটি বক্তব্য প্রদান করেন। (৫) হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে বেলজিয়ামে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের সামনে একটি বক্তব্য প্রদান করেন যেখানে ৩০ টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। (৬) হুযুর আনোয়ার (আই.) জার্মানীর হামবার্গ এ মসজিদ বায়তুর রশীদে একটি বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের নিম্নোক্ত বিশ্ব নেতাদের এবং ধর্মগুরুদের পত্রও লিখেছেন।

| |
|---|
| Holiness Pode Benedict XVi |
| Prime Minister of Israel |
| President of Islamic republic of Iran |
| President of the United States of America |
| Prime Minister of Canada |
| Custodian of the two Holy places of the kingdom of Saudi Arabia |
| Prime Minister of State council of the people's republic of China |
| Prime Minister of United kingdom. |
| The Chancellor if Germany |
| President of the French republic. |
| Her Majesty the Queen of United Kingdom and Commonwealth realms |
| The supreme Leader of the Islamic republic of Iran. |

মানুষকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষার জন্য শান্তি সম্মেলন

শান্তি প্রতিষ্ঠার সেই সব চেষ্টার মধ্যেই একটি হল শান্তি সম্মেলন। যা প্রতি বছর জামাত আহদীয়া ব্রিটেনের পক্ষ থেকে লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্র তাহের হলে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এইসব শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন চিন্তাধারা সংগঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নারী ও পুরুষ এবং বিভিন্ন পার্লামেন্টের সদস্যবর্গ, লন্ডন শহরের মেয়র সাহেব, দেশের নেতাগণ, বিভিন্ন শহরের হাইকমিশনারগণ এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জামাত আহমদীয়ার আমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে থাকে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জামাত আহমদীয়াকে সাধুবাদ জানিয়ে থাকে। এই সব সভার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিত্ব হিসেবে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ উপস্থাপিত হয়ে থাকে। যেখানে তিনি ইসলামী শিক্ষা ও জগতের পরিস্থিতির নিরিখে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর অনুবর্তিতায় তাঁর খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ধর্মের নামে তরবারির ধারণাকে দূরীভুত করার এক মহা অভিযানের পতাকা নিজ হাতে খোদা তা'লার সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে সফলতার সাথে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আদর্শের আলোকে গোটা বিশ্বে ইসলামের শান্তি প্রিয় বার্তা প্রসারের কাজে ব্যাপৃত আছেন।

লন্ডনের দারুল উলুম হোক বা আমেরিকার ক্যাপিটাল হিল, বেলজিয়ামে অবস্থিত ইউরোপিয়ান

এরপর ১৫-এর পাতায়.....

# বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর প্রচেষ্টা

আব্দুল আলীম, আফতাব, নুরুল ইসলাম বিভাগ

বিশ্ব এখন অতি দুর্যোগময় সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট প্রায় প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন ও গভীরতর বিপদের রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগের সাথে এর তুলনা বারবার উচ্চারিত হচ্ছে আর স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে যে, ঘটনাবলী পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে দ্রুত গতিতে এক ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে যে, অবস্থা দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, আর মানুষ পথ চেয়ে আছে যে, কেউ ময়দানে অবতীর্ণ হবেন এবং নিরেট বাস্তবতার নিরিখে যথাযথ ও শক্তিশালী দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন যার উপর তারা ভরসা রাখতে পারে আর যা তাদের হৃদয়ের ও মনের কথা বলবে আর তাদের মনে এ আশার সঞ্চার করবে যে, এমন পথ রয়েছে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একটি পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণাম এতটাই প্রলয়ঙ্করী যে বিষয়ে চিন্তা করতেও কেউ সাহস করে না।

এহেন পরিস্থিতিতে মানবতার জন্য শান্তির দূত, অশেষ সহানুভুতিশীল, দুঃখ নিবারণকারী হিসেবে এক বীর পুরুষ বিপন্ন মানবতার পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন যার ধীর ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর মানুষকে নিমেষেই মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলতে পারে আর যাঁর চেহারার জ্যোতিঃ যে কোন ব্যক্তিকে বিস্ময়বিহ্বল করে দিতে পারে আর যাঁর দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে বিদ্যুতের ঝলকানি আর যাঁর কারণে তাঁর অনুরাগীরা জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে সব সময় প্রস্তুত রয়েছে। সেই মহান পুরুষ হলেন শেষ যুগের মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। তিনি নির্ভীকভাবে বিশ্বের সামনে ঘোষণা দিয়ে এসেছেন কোন দিকে সব কিছু অগ্রসর হচ্ছে- আতঙ্ক সৃষ্টি করতে নয় বরং এ চিন্তার জন্য প্রস্তুত করতে যে, কেন বিশ্ব আজ এ অবস্থায় উপনীত আর কিভাবে বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে এবং কিভাবে এ বিশ্ব পল্লীতে বসবাসকারী সকল মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার এক পথ রচনা করা যায়। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, বিশ্বের জন্য শান্তি নিশ্চিত করার একটিই পথ আর তা হল বিশ্ব যেন বিনয় ও ন্যায়ের দিকে ঝোঁকে আর অবনত মস্তকে খোদাতা'লার দিকে মুখ ফেরায়; মানুষ যেন মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করে আর শক্তিশালীরা (সবলরা) যেন দুর্বলের সাথে মর্যাদাবোধ ও শ্রদ্ধা এবং ন্যায়ের সাথে আচরণ করে আর দুর্বল ও দরিদ্ররাও যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে আর সকলে যেন তাদের স্রষ্টার দিকে একান্ত বিনয় ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে প্রত্যাবর্তন করে। বার বার তিনি আমাদের এক এক করে প্রত্যেককে স্মরণ করিয়েছেন যে, ধ্বংসের কিনারা থেকে ফিরে আসার পথ হল জাতিসমূহের পারস্পরিক সকল লেন-দেনে ন্যায়কে যেন এক অপরিত্যাজ্য শর্ত গণ্য করে। এমনকি যদি তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতাও থাকে তবু তাদের জন্য ন্যায়ের অবলম্বন আবশ্যক, কেননা ইতিহাস আমাদেরকে শিখিয়েছে যে, ভবিষ্যতের সকল প্রকার বিদ্বেষের চিহ্নকে নির্মূল করে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার এটিই একমাত্র পথ। এটি পবিত্র কোরআনের সেই শিক্ষা বিশ্ব নেতৃবর্গের কাছে লেখা পত্রসমূহে তিনি যার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় পৃথিবীর সকল চিন্তাধারার মানুষ অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর প্রমূখ নেতৃবর্গ ও নীতি-নির্ধারক, ফেইথ এন্ড সিভিক ইন্টেলিকচুয়ালস এবং প্রশাসকবর্গকে টার্গেট করেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের সামনে তার প্রচেষ্টা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি গঠনমূলক কাজের উপর আলোকপাত করব।

## পার্লামেন্টস-এ ভাষণ

তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংসদ ভবনে এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দান করেছেন। যেমন-

| |
|---|
| The Bristish Parliament House of Common |
| Military Headquarters Koblenz Germany |
| Capital Hill Washington D.C, USA |
| European Parliament, Brusels, Belgium |
| New Zealand Parliament |
| Canadian Parliament |

এখানে নমুনা হিসেবে কয়েকটি তুলে ধরা হল।

## ব্রিটিশ পার্লামেন্ট

## The House of Common-এ ভাষণ দান

প্রকৃত ন্যায়-বিচারের দাবি এই যে, এদের আবেগ-অনুভূতি ও ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতিও সম্মান দেখানো হয়। এটাই সেই পথ যেটিতে মানুষের মনের শান্তি বজায় থাকবে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে,যখন ব্যক্তি পর্যায়ের মনের শান্তি বিঘ্নিত হয় তখন সামাজিক পর্যায়েও মনের শান্তি বিঘ্নিত হয়। ..... কিন্তু যদি ধর্মের নামে এমন কোন রীতি পালন করা হয় যা অন্যের ক্ষতি করে আর দেশের আইনের বিরুদ্ধে যায়, তখন রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারীগণ ব্যবস্থা নিতে পারেন, কেননা যদি কোন ধর্মে কোন নিষ্ঠুর রীতি-রেওয়াজ প্রচলিত থাকে তবে তা খোদাতা'লার কোন নবীর শিক্ষা হতে পারে না। স্থানীয় পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি স্থাপনে এটাই মৌলিক নীতি। উপরন্তু, ইসলাম আমাদের শেখায় যে, যদি তোমার ধর্ম পরিবর্তনের কারণে কোন সমাজ, বা কোন গোত্র, বা কোন সরকার তোমার ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে, আর এর পরবর্তীতে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে তোমার অনুকূলে চলে আসে, তাহলে সর্বদা মনে রাখবে যে তাদের প্রতিও তুমি কোন প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ রাখবে না। তুমি তখন প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তাও করবে না, বরং ন্যায়-বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করবে। পবিত্র কোরআনে বলে-

'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়-পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদৌ এই অপরাধ করতে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়-বিচার না কর। তোমরা সু-বিচার করো ইহা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।'

(আল মায়েদা, আয়াত:৯)

পবিত্র কোরআন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু সুবর্ণ নীতি বর্ণনা করেছে। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, লোভে শত্রুতা বৃদ্ধি পায় কখনও এটা নিজ ভৌগলিক সীমারেখার সম্প্রসারণে প্রকাশ পায়, আর কখনও বা প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ করায়ত্ব করার মধ্য দিয়ে, আর কখনও কেবলমাত্র অন্যের উপর নিজ আধিপত্যের নিদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্যে। এর ফল স্বরূপ বিশ্ব সংকট ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটে-তা নির্দয় স্বৈরশাসকদের হাতে হোক, যারা নিজ জনগণের অধিকার হরণ করে এবং নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে থাকে, বা কোন আগ্রাসী শক্তির হাতে যারা বাইরে থেকে দেশে প্রবেশ করে। কখনও নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত মানুষের কান্নার রোল বহির্বিশ্বের কানেও গিয়ে পৌঁছে। এতে যাই হোক না কেন, আমাদের মহানবী (সাঃ) এ সোনালী শিক্ষা দিয়েছেন যে, অত্যাচারীত এবং অত্যাচারী উভয়কে সাহায্য কর। মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন যে, একদিকে অত্যাচারিতকে সাহায্য করার বিষয়টি তো তারা বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করা

যেতে পারে? মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন, "তার হাতকে অত্যাচার করা থেকে নিবৃত্ত করার মাধ্যমে, কেননা অত্যাচারে সীমালঙ্ঘন তাকে খোদার শাস্তির পাত্র বানিয়ে দেয়।"

(সহী বুখারী, কিতাবুল ইকরাহ)

সুতরাং তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তোমরা তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা কর। আমাদের সমাজের ক্ষুদ্রতম পরিসর (ব্যক্তি সত্ত্বা)-কে ছাড়িয়ে এ নীতি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

'এবং যদি মোমেনদের দুই দল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাবে; যদি (মীমাংসার পরে) তাদের উভয়ের মধ্য হতে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করে আক্রমণ করে তাহলে তোমরা সকলে মিলে যে বিদ্রোহ করেছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি সে ফিরে আসে, তাহলে তোমরা উভয়ের মধ্যে ন্যায়-পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং সু-বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন।' (আল হুজরাত, আয়াত:১০)

যদিও এ শিক্ষা মুসলমানদের সম্পর্কে, তবে এ নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে বিশ্বজনীন শান্তির ভিত্তি রচনা করা সম্ভব। শুরুতেই বলা হয়েছে, শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রথম শর্ত হল ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। আর যদি ন্যায়বিচারের নীতি অবলম্বন সত্ত্বেও শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে একতাবদ্ধ হও এবং সমবেতভাবে ঐ পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং লড়তে থাক যতক্ষণ না সেই সীমালঙ্ঘনকারী পক্ষ শান্তি স্থাপনে সম্মত হয়। একবার যখন তারা শান্তি স্থাপনে প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন ন্যায়-বিচারের দাবি হল : সেই অত্যাচারির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ, কিন্তু, এর পাশাপাশি তার অবস্থার উন্নয়নের দিকে চেষ্টা কর। আজ বিশ্বের কোন কোন দেশে বিদ্যমান অস্থিরতার অবসান করতে হলে-আর দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের মধ্যে বেশ কিছু মুসলিম দেশ অগ্রগণ্য-বিশেষ করে ভেটো প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী দেশগুলোর বিশ্লেষণ করে নির্ণয় করা উচিত যে, সেখানে সঠিকভাবে ন্যায়বিচার প্রয়োগ করা হয়েছে কি না। যখনই সাহায্যের প্রয়োজন হয়, শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর প্রতিই সাহায্যের আবেদন করা হয়।

## মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটাল হিলে প্রদত্ত ভাষণ

২৭শে জুন, ২০১২ ওয়াসিংটন ডি. সি.-র ক্যাপিটল হিল (সংসদ ভবন)-এ মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পঞ্চম খলিফা ও আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস সদস্য, সিনেটর, রাষ্ট্রদূত, হোয়াইট হাউস ও স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর কর্মকর্তা, এন. জি. ও. নেতা, ধর্মীয় নেতা, অধ্যাপক, নীতির বিষয়ে পরামর্শক, আমলা, কুটনীতিবিদ, বিভিন্ন থিংক ট্যাংক ও পেন্টাগণ-এর প্রতিনিধি এবং মিডিয়ার পক্ষ থেকে উপস্থিত সাংবাদিকগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গীনভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অর্জিত হতে পারে না। আর এই নীতিটি জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করেন। নৈরাজ্য সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর কিছু মানুষ ছাড়া কেউ এ কথা দাবি করে বলতে পারে না, অমুক সমাজে বা দেশে অথবা গোটা পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির রাজত্ব বিরাজ করতে দেখছি।

তিনি বলেন–

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে, কয়েকটি দেশের নেতারা ভবিষ্যতে বিশ্বের সকল জাতির মাঝে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের আকাঙ্খা পোষণ করেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে 'লীগ অব্ নেশনস্' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল, বিশ্ব জুড়ে শান্তি বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধ প্রতিহত করা। দুঃখজনকভাবে, এর সংবিধান ও প্রস্তাবাবলীতে এমন কিছু ত্রুটি এবং দুর্বলতা ছিল যা সমভাবে সকল মানুষ ও সকল জাতির অধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। আর এ কারণেই অনেক দেশ একের পর এক 'লীগ' থেকে সরে পড়তে আরম্ভ করে। এতে বিরাজমান সেই অসাম্যের কারণে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি অর্জন সম্ভব হয়নি। 'লীগের' প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এ পৃথিবীকে সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়। ..... আমরা সবাই এই বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে অবহিত। এতে বিশ্ব জুড়ে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, যাদের অনেকেই ছিল বেসামরিক নিরীহ জনসাধারণ। এই যুদ্ধ বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত হওয়া উচিত ছিল। এটি ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সকল পক্ষের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করে এমন বিচক্ষণ নীতি নির্ধারণের উপলক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল যা বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি উপকরণ সাব্যস্ত হতে পারতো। ..... কিন্তু আজ আমরা শক্তিশালী এবং দুর্বল জাতিসমূহের মাঝে পারস্পরিক বিভেদ ও বৈষম্য দেখতে পাই। উদাহরণ স্বরূপ, জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশের মাঝে আমরা বৈষম্য লক্ষ্য করি। অনুরূপভাবে, নিরাপত্তা পরিষদে কিছু 'স্থায়ী' সদস্য আছে আবার কিছু আছে 'অস্থায়ী'। এই বিভাজন উদ্বেগ ও হতাশার আভ্যন্তরীণ একটি কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয় আর এ জন্য আমরা প্রায়শই কয়েকটি দেশকে এই অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর দেখতে পাই।

হুযুর (আই.) বলেন- ইসলাম ধর্ম সকল ক্ষেত্রে নিখাদ ন্যায় প্রতিষ্ঠার ও সাম্যের শিক্ষা দেয়। আমরা পবিত্র কোরআনের ৫নম্বর সূরার ৩ নম্বর আয়াতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেখতে পাই। এই আয়াতে বলা হয়েছে, ন্যায়ের দাবী সমুন্নত রাখতে হলে এমন লোকদের সাথেও ন্যায্য ও সাম্যের আচরণ করা আবশ্যক, যারা ঘৃণ্য ও শত্রুতা প্রদর্শনে সকল সীমা অতিক্রম করে।

এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন দাঁড়ায় ইসলাম যে ন্যায় পরায়ণতার কথা বলে, এর মানদন্ড কী? পবিত্র কোরআনের ৪নম্বর সূরার ১৩৬নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, কাউকে যদি তার নিজের বিরুদ্ধে বা তার পিতা-মাতার বিরুদ্ধে বা তার সবচেয়ে প্রিয় কারও বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয়, ন্যায়-নীতি এবং সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য তার এ কাজ করা উচিত।"

(ভাষণ: বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ, হুযুর আনোয়ার কর্তৃক প্রদত্ত)

## হল্যান্ডের সংসদে ভাষণ

হুযুর আনোয়ার বলেন-

কোরআন শরীফের সূরা নহলের ১২৭ নম্বর আয়াতে ইসলামি সরকারকে বলা হয়েছে যে, যদি কখনো তাদের উপর আক্রমণ করা হয়, তাদের উপর যতটা আক্রমণ করা হয়েছে ততটাই আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা তারা নিতে পারে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধ যা করা হয় তার অনুপাতে ব্যবস্থার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সূরা আনফালের ৬২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, তোমার বিরোধীরা যদি তোমার উপর হামলা করার পরিকল্পনা করে এবং এরপর যদি তারা বিরত হয় এবং বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার পথ মীমাংসার জন্য হাত বাড়ায় তাহলে তোমাকে অবশ্যই মীমাংসার হাত বাড়ানো উচিত এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানে যাওয়া উচিত। তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন।

কোরআন করীমের এই শিক্ষা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য চাবিকাঠি স্বরূপ। আজকের বিশ্বে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় যারা অন্য দেশ আক্রমণ করবে এই আশঙ্কায় তাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। মনে হয় তারা এই নীতির ভিত্তিতে কাজ করে যে, শত্রুদের আক্রমণ করার পূর্বে তাদের ধ্বংস করে দেওয়া উচিত। যাই হোক ইসলামের শিক্ষা হল শান্তির কোন প্রচেষ্টাই নষ্ট না করা এবং কোন ক্ষেত্রে শান্তির যদি ক্ষীণ আশাও দেখা যায় সেটিকেও কাজে লাগানো উচিত।

কোরআন করীমের সূরা মায়েদার ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, কোন জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের এ কথায় প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার করো না। ইসলামের শিক্ষা হল সকল অবস্থাতেই, পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন ন্যায় এবং ইনসাফের নীতির সাথে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। তাই যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও ইনসাফ ও সুবিচার অসাধারণ গুরুত্ব রাখে। আর যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে বিজয়ীর ইনসাফ করা উচিত। কোনরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করা উচিত নয়। যাই হোক আজকের বিশ্বে আমরা

এমন উন্নত নৈতিক আদর্শ দেখতে পাই না। বরং যুদ্ধ শেষে আমরা দেখতে পাই যে, বিজয়ী দেশগুলো পরাজিত দেশগুলোর উপর এত বেশি বিধিনিষেধ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যে, সে জাতির সত্যিকার স্বাধীনতাই আর থাকে না এবং স্বাধীনতা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখে। এমন নীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নষ্ট করছে। আর এর ফলে অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অনেক নেতিবাচক ফলাফল প্রকাশ পাচ্ছে। সত্য কথা হল স্থায়ী শান্তি কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যদি সমাজের সকল স্তরে ইনসাফ বা ন্যায়-বিচার না করা হয়।

## শান্তি সম্মেলন

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানাবিধ কার্যকলাপের মধ্যে শান্তি সম্মেলন হল একটি অন্যতম প্রচেষ্টা। ২০০৪ সালে এই সম্মেলনের সূচনা হয়। এই ধরণের শান্তি সম্মেলন কেবল যুক্তরাজ্য আর ভারতেই নয় বরং পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই আয়োজিত হয়ে থাকে যেখানে জামাতে আহমদীয়ার অস্তিত্ব আছে। এই সম্মেলনগুলিতে শান্তি ও সমন্বয়ের চিন্তাধারা এবং পারস্পরিক মত বিনিময়ের বিষয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে সমস্ত চিন্তাধারার মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলির মধ্যে কয়েকটি নমুনা হিসেবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

(১) সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১২ সালের ২৪ শে মার্চ তারিখে বায়তুল ফুতুহ মসজিদে 'পারমাণবিক বোমার ভয়াবহ পরিণাম এবং পূর্ণ ন্যায় নীতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ের উপর নবম বাৎসরিক শান্তি সম্মেলনে ভাষণ প্রদান করতে গিয়ে বলেন-

" আমার মনে আছে যে, কয়েক বছর পূর্বে এই হলঘরেই আমাদের শান্তি সম্মেলনের সময় আমি একটি বক্তব্যে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় এবং মাধ্যম বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছিলাম আর আমি একথারও উল্লেখ করেছিলাম যে, রাষ্ট্রপুঞ্জকে কিভাবে কাজ করা উচিত। পরে আমাদের অতি সম্মানীয় বন্ধু লর্ড এরিক ইউবরি বলেছিলেন যে, এই ভাষণটি রাষ্ট্রপুঞ্জে উপস্থাপিত হওয়া উচিত। এটি তাঁর মহানুভবতা ছিল যে কারণে তিনি এমন সাহসিকতা ও সহৃদয়তার সঙ্গে একথা প্রকাশ করেছেন। যাই হোক আমি একথা বলতে চাই যে, কেবল ভাষন দান করা বা শুনে নেওয়াই যথেষ্ট নয় আর মুখের কথাতেই শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। এই মহান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রাথমিক শর্তটি হল সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়-নীতি অবলম্বন করা। কুরআন করীমের ৪ নং সূরার ১৩৬ নং আয়াতে এই সম্পর্কে একটি সোনালী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ন্যায়-নীতির দাবি পূর্ণ করতে হবে, নিজের অথবা পিতামাতার, ভাইয়ের, নিজের বন্ধুর এবং নিকট আত্মীয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হলেও। এটি হল প্রকৃত ন্যায়-নীতি যেখানে সম্মিলিত স্বার্থের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ করা হয়।"

আমরা যদি এই নীতিটিকে সামগ্রিক পরিসরে বিশ্লেষণ করি তবে বুঝতে পারব যে, সম্পদ ও শক্তির প্রভাবে ন্যায়-নীতি বর্হিভূত সিদ্ধান্ত স্বীকারে বাধ্য করার যে পন্থা অবলম্বন করা হয় তা পরিহার করা উচিত। এর পরিবর্তে প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিবর্গ ও দূতদেরকে একনিষ্ঠভাবে ন্যায় ও সাম্যের নীতির সমর্থনের আকাঙ্খা নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত। আমাদেরকে যাবতীয় প্রকারের বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্বকে নির্মূল করতে হবে, কেননা, শান্তি প্রতিষ্ঠার এটিই একমাত্র পথ। আমরা যদি রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা বা নিরাপত্তা পরিষদের বিষয়ে পর্যালোচনা করি তবে আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে উপস্থাপিত অধিকাংশ ভাষণ বা তাদের জারি করা বিবৃতি অত্যন্ত সমাদৃত হয়; কিন্তু এটি অর্থহীন হয়ে পড়ে যখন মূল সিদ্ধান্ত পূর্বেই গৃহীত হয়ে যায়। অতএব যেখানে পরাশাক্তিগুলি প্রভাবাধীনে ন্যায়-নীতি ও নিজেদের আত্মাভিমানের বিপরীতে সিদ্ধান নেওয়া হয় সেখানে এমন ভাষণ অন্তঃসারশূন্য এবং অনর্থক রূপে প্রতীত হয় এবং তা পৃথিবীকে প্রতারিত করার কাজেই অসতে পারে।

অতএব যদি বৃহশক্তিগুলি ন্যায়-নীতির পথ ত্যাগ করে এবং ক্ষুদ্র দেশগুলির প্রবঞ্চনার অনুভুতিকে দূরীভূত না করা হয় এবং উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন না করা হয় তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে আর তখন অবশিষ্ট থাকবে কেবল ধ্বংসের চিহ্ন যা আমাদের কল্পনার অতীত, বরং পৃথিবীর অধিকাংশ শান্তিকামী মানুষও এই ধ্বংসলীলা থেকে নিস্তার পাবে না। অতএব আমার আন্তরিক বাসনা এবং আকাঙ্খা হল পরাশক্তিগুলির নেতৃবর্গ যেন এই ভয়াবহ সত্যকে উপলব্ধি করে আর প্রজ্ঞাহীন পন্থা অবলম্বন করে নিজেদের স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ করার পরিবর্তে এমন প্রজ্ঞা অবলম্বন করার চেষ্টা করে যার ফলে ন্যায়ের বিকাশ ঘটে এবং এটি সুনিশ্চিত করা যায়।

(২) অনুরূপভাবে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে ২০১৫ সালে ১৪ ই মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত 'শানি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সোনালী নীতি; শীর্ষক শান্তি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেন- এটি একেবারে স্পষ্ট যে, যখনই এবং যেখানেই কেউ তার ঘৃণ্য অত্যাচার এবং নিপীড়নকে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করে তখন তার তীব্র নিন্দা করা উচিত। আর এটিও স্পষ্ট যে, এমন জুলুম ও অন্যায়ের সঙ্গে ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

তিনি বলেন: যেরূপ এর পূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি যে, আমি একথা স্বীকার করি না যে, বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে নীতি-নির্ধারকগণ এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসবাদের অবসানের জন্য কোন জরুরী এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

আমার মতে এই পদক্ষেপটি অনেক বেশি কার্যকর এবং প্রভাবী হবে যে, বৃহতশক্তিগুলি যদি স্থানীয় শক্তিগুলির সাহায্য করে এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করে পারস্পরিক বিশ্বাসকে ও আস্থা দৃঢ় কর হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সাথে একটি বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচি গ্রহণ করে উগ্রবাদ এবং বিদ্বেষমূলক চিন্তাধারা ছড়ানো বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। দেশের বিদ্রোহীদেরকে সৈনিক প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র সরবরাহ করার পরিবর্তে এই পন্থা অবলম্বন করা অনেক কার্যকরী প্রমাণিত হবে। এই ধরণের নীতি এই সমস্ত দেশে কেবল নৈরাজ্য ও অশান্তির প্রসারের কারণ হবে, যদিও আমরা এই ধরণের নেতিবাচক পদক্ষেপের ভয়াবহ পরিণাম স্বচক্ষে দেখেছি।

কিছুকাল পূর্বে কিছু বৃহৎশক্তি সিরিয়া সরকারের বিদ্রোহীদেরকে সৈন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিল যাদের সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ পায় যে, সেই সমস্ত বিদ্রোহীরা সৈন্য প্রশিক্ষন এবং অত্যাধুনিক অস্ত্র লাভ করার পর সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিতে যোগ দেয়। এরপর আজ হাজার হাজার সিরিয়ার বিদ্রোহীদেরকে তুরস্ক, কাতার এবং সউদী আরবে সৈন্য প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে।

আমার বিশ্বাস, এটি বেশি কার্যকর হবে যদি বৃহতশক্তিগুলি পারস্পরিক আস্থা অর্জন করে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সাহায্য করে আর এই সাহায্য এই শর্তে হওয়া উচিত যে, তারা নিজেদের দেশের জনসাধারণের প্রতি ন্যায়-নীতির দাবি পূরণ করবে এবং কোনওভাবেই তাদের অধিকার লঙ্ঘন করা হবে না।

সংক্ষেপে বলব যে, এই উগ্রবাদের অবসানের জন্য যে সব পদক্ষেপ এ যাবৎ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে সেগুলি কার্যকরী প্রমানিত হয় নি। আমরা যদি লিবিয়ার বিষয়ে দৃষ্টিপাত করি তবে দেখব যে, কয়েক বছর পূর্বেই কিছু শক্তি জোরপূর্বক গাদ্দাফীর সরকারের গদি উল্টে দিতে স্থানীয় বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিল। কিন্তু পরিশেষে কি অর্জিত হল? এর ফলে কি কোন লাভ হয়েছে না কি লিবিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মানে কোন উন্নতি ঘটেছে? নিশ্চয় হয় নি। পরিবর্তে দেশটাই ধ্বংস হয়ে গেছে আর সেটি সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

## আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ২০০৯ সাল থেকে যুক্তরাজ্যের শান্তি সম্মেলনে এমন সংগঠন বা ব্যক্তি নির্বাচন করে আহমদদীয়া শান্তি পুরস্কার প্রদান করছে যারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টারত রয়েছেন। এই সাম্মানিক পুরস্কারের সঙ্গে দশ হাজার পাউন্ড নগদ রাশিও দেওয়া হয়ে থাকে।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম প্রয়াসের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৯ সালে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পক্ষ থেকে প্রথম আহমদীয়া মুসলিম শান্তি পুরস্কার অর্জন করেন মাননীয় লর্ড এরিক এভেবারী সাহেব।

অপরদিকে ভারতের মহারাষ্ট্রের Mother of Orphans শ্রীমতি সন্ধু তাঈ স্পীকাল সাহেবাকে যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে অনাথ ও অসহায় শিশুদের বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য তাঁর সেবার স্বীকৃতি

হিসেবে হুযুর আনোয়ার (আই.) স্বয়ং আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার প্রদান করেন।

## বিশ্ব নেতাদের নিকট পত্র

অনুরূপভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.) পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য এবং কার্যকরী প্রচেষ্টার অধীনে বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় ধর্মীয় ও রাজনীতিক নেতৃবর্গকে চিঠি লেখেন যাতে তিনি তাদেরকে স্মরণ করানোর চেষ্টা করেছেন যে, আজ মানবতা কিরূপ ধ্বংসাত্মক বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ইসলামী শিক্ষার আলোকে সকলকে মানবতা এবং এই বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন এবং বলেন যে, এই দায়িত্ব আমাদের কিভাবে পালন করা উচিত। সেই পত্রাবলীর মধ্যে কয়েকটি নমুনা হিসেবে তুলে ধরা হল।

### (১) ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রীর নিকট পত্র-

অতএব, আপনার কাছে আমার আবেদন এই, বিশ্বকে একটি বিশ্বযুদ্ধের করাল গ্রাসের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে নেতৃত্ব না দিয়ে, পৃথিবীকে একটি বিশ্বজনীন ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষার জন্য আপনারা বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ সর্বোচ্চ প্রয়াস গ্রহণ করবেন। বিরোধ সমূহকে বল প্রয়োগে নিরসন না করে, আপনাদের প্রয়াস হওয়া উচিত যেন সংলাপের মাধ্যমে এগুলোর সুরাহা হয়, যেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহকে প্রতিবন্ধীতা ও জন্মগত ত্রুটিসমূহ 'উপহার' দেওয়ার পরিবর্তে আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারি।

**(২) ইরান গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি লেখেন-** বিশ্বে বর্তমানে খুব উত্তেজনা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। কোন কোন এলাকায় ছোট পর্যায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে, অপর দিকে পরাশক্তিগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক দেশ তার কর্মকাণ্ডে অন্য কোন দেশকে হয় সমর্থন করছে বা বিরোধিতা করছে; তবে, ন্যায়ের দাবিকে পূর্ণ করা হচ্ছে না। পরিতাপের বিষয় যে, যদি আমরা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, আমরা দেখি যে, আর একটি বিশ্ব যুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে।

**(৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওবামাকে তিনি লেখেন-** যেমনটি আমরা সকলে অবহিত আছি, যে মূল বিষয়গুলো পৃথিবীকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছিল তা হল 'লীগ অব নেশন্‌স'-এর ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক মন্দা, যার সূচনা হয়েছিল ১৯৩২ সালে। আজ শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের সাথে ১৯৩২ সালের পরিস্থিতির অনেকধ সাদৃশ্য রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর কারণে আবারও ছোট ছোট দেশের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা করেছে, আর দেশগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বও অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিণামে এর ফলে এমন শক্তিসমূহ সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবে যারা আমাদেরকে একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে।

যদি ছোট ছোট দেশগুলিতে রাজনৈতিক বা কুটনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি সম্ভব না হয়, এর ফল স্বরূপ বিশ্বে নতুন মেরুকরণ ও গ্রুপিং এর উদ্ভব হবে। এটি হবে তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের পূর্বলক্ষণ। তাই আমার বিশ্বাস যে আজ, বিশ্বের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ না করে, এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় যে, আমরা এ ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষার জন্য জরুরী ভিত্তিতে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা জোরদার করি। মানব জাতির জন্য আশু প্রয়োজন তার সেই একক খোদাকে চেনার, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা; কেননা একমাত্র সেটাই মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা দান করতে পারে; নতুবা বিশ্ব ক্রমাগত দ্রুতগতিতে আত্মহননের পথে অগ্রসর হতে থাকবে।

**(৪) যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীকে লেখেন-** এটা আমার অনুরোধ যে, প্রত্যেক স্তরে এবং প্রত্যেক আঙ্গিকে আমাদেরকে ঘৃণার আগুন নির্বাপিত করার সর্বোচ্চ প্রয়াস নিতে হবে। কেবল মাত্র যদিআমরা এ চেষ্টায় সফল হতে পারি তবেই আমাদের অনাগত প্রজন্ম সমূহের জন্য এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দিতে পারবো। কিন্তু যদি আমরা এ কাজে ব্যর্থ হই, তবে আমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই যে, নিউক্লিয়ার যুদ্ধের কারণে সর্বত্র আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সমূহকে আমাদের কর্মের ভয়াবহ পরিণাম বহন করতে হবে আর পৃথিবীকে এক বিশ্বজনীন বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা কখনো তাদের অগ্রজদের ক্ষমা করবে না। আমি আবার স্মরণ করাচ্ছি যে, ব্রিটেন ঐ সকল দেশের অন্যতম যারা উন্নত ও উন্নয়ণশীল বিশ্বে প্রভাব রাখতে পারে এবং রেখে থাকে। আপনারা চাইলে ন্যায়-বিচার ও নিরপেক্ষতার দাবি পূরণ করে বিশ্বের পথ দেখাতে পারেন। তাই ব্রিটেন এবং অন্যান্য বৃহৎ শক্তির উচিত বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা। সর্ব শক্তিমান খোদা আপনাকে ও অন্যান্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এ বার্তা অনুধাবনের সুযোগ দান করুন।

## লিফলেট বিতরণ

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় পৃথিবীর প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন এবং প্রত্যেককে এই শান্তি অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করার উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে শান্তি বিষয়ক লিফলেট বিতরণের জন্য সারা বিশ্বের জামাত আহমদীয়াকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর এই নির্দেশের আলোকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জামাত আহমদীয়ার লক্ষ লক্ষ অনুগামীরা কোটি কোটি সংখ্যায় শান্তি সংবলিত লিফলেট প্রকাশ করে বিতরণ করছে এবং শান্তি প্রসারের এই অভিযানে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করছে।

এবছরের বার্ষিক রিপোর্ট অনুসারে ২০১৭ সালে ভারতে ছয় লক্ষ আর সমগ্র বিশ্বে সত্তর লক্ষের বেশি লিফলেট বিতরিত হয়েছে। এই ভাবে এক বছরের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে লিফলেটের মাধ্যমে শান্তির বাণী পৌঁছানো হয়েছে এবং প্রত্যেক বছর এতে বৃদ্ধি ঘটছে। আলহামদোলিল্লাহ।

সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) ২৩ শে নভেম্বর ২০১৫ সালে জাপানের ওটোয়া শহরে হিলটন হোটেলে সম্মানীয় অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করে বলেন-

আমি আপনাদের সকলের কাছে আবেদন করছি যে, আপনারা নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে পৃথিবীতে শান্তি ও সমন্বয়ের বিকাশের জন্য চেষ্টা করুন। আমাদের সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব হল, পৃথিবীতে যেখানেই অশান্তি ও উত্তেজনার উদ্ভব হয় সেখানে আমরা যেন ন্যায়ের জন্য সরব হই এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি যাতে আমরা সেই ভয়াবহ যুদ্ধ থেকে নিরাপদ থাকি যা আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল আর যার ভয়াবহ পরিণাম দশকের পর দশক ধরে পরিলক্ষিত হচ্ছে আর আজও তা অনুভব করা যায়। যদিও সীমিত পরিসরে এক বিশ্ব যুদ্ধের সূত্রপাত ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে; কিন্তু আমাদের উচিত নিজেদের দায়িত্বকে যথাসময়ে পালন করা। অন্যথায় এর কুপ্রভাব বিস্তার লাভ করে গোটা জগতকেই গ্রাস করে ফেলবে এবং সেই সমস্ত ভয়াবহ মারণাস্ত্র প্রয়োগ হবে যা ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিবে।

আসুন আমরা সকলে মিলে নিজেদের কর্তব্য পালন করি। বিরোধী জোট তৈরী করার পরিবর্তে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের পরস্পরের সহযোগিতা করা উচিত। এখন আমাদের কাছে আর অন্য কোন বিকল্প নেই, কেননা বিশ্ব তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ যদি যথারীতি আরম্ভ হয়ে যায় তবে তার ভয়াবহতা এবং বিধ্বংসী পরিণাম সম্পর্কে আমরা কল্পনাও করতে পারব না। অতএব, পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে উপলব্ধি করুন, পাছে বিলম্ব না হয়ে যায়। আর মানুষ যেন খোদা তা'লার প্রতি নতজানু হয়ে তাঁর এবং নিজেদের পরস্পরের অধিকার প্রদানে যত্নবান হয়।

আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বোধশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করুন যারা ধর্মের নামে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করছে আর যারা আর্থিক দুরাভিসন্ধি নিয়ে ভৌগলিক এবং রাজনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। তাদের অভিসন্ধি যে কতটা অসঙ্গত এবং ভয়ানক, যদি তারা এই সত্যটি উপলব্ধি করত! খোদা করুক পৃথিবীর সর্বত্র স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। আমীন।

**********

# সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও মানব সেবায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অমূল্য উপদেশাবলী

নাসির আহমদ আরিফ, মুরুব্বী সিলসিলা, অনুবাদ: আজিবুর রহমান, মুবাল্লিগ সিলসিলা

আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআনে বলেন-

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সহিত কোন কিছুকেই শির্ক কর না এবং সদ্ব্যবহার কর পিতা-মাতার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজন এবং এতিম এবং মিশকিন এবং আত্মীয় প্রতিবেশীগণের সহিত এবং সঙ্গি সহচর এবং পথচারীদের সহিত এবং তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে তাদের সহিত। আল্লাহ্ তাদেরকে আদৌও ভালোবাসেন না যারা অহংকারী ও দাম্ভিক।

(আন নিসা: ৩৭)

ইসলাম ধর্ম অনুসরণের আমরা সৌভাগ্য লাভ করেছি যা প্রত্যেক দিক থেকে এক পরিপূর্ণ ধর্ম। যদি আমরা এই মহান ধর্মের শিক্ষামালার সারাংশ হল আল্লাহ তা'লার অধিকার ও তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদান করা। উল্লেখিত আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইসলাম ধর্মে বান্দাদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআনে কত স্পষ্টভাবে ও সুন্দর উপদেশ প্রদান করেছেন। যেখানে আল্লাহতা'লা সংক্ষেপে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে তাঁর অধিকার ও তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা করেছেন।

বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজের উন্নত চরিত্র ও কার্যবিধির মাধ্যমে সৃষ্টির অকৃত্রিম সেবা করেছেন। এমনকি তিনি (আঃ) মানবজাতির সেবার্থে নিজ জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এবং ধর্ম ও জাতির ভেদাভেদ না করে বিভিন্ন সময়ে সেবা করে গেছেন। তিনি (আঃ) নিজের অনুসারীদেরও এই পবিত্র শিক্ষা প্রদান করেছেন-

" আমাদের নীতি হল সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভুতি করা। যদি কোন ব্যক্তি দেখে যে, তার হিন্দু প্রতিবেশীর বাড়িতে আগুন লেগেছে আর সে তা নিভানোর জন্য সাহায্য করতে ছুটে না আসে; আমি সত্যি সত্যি বলছি যে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমার অনুগামীদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি দেখে যে, কোন খৃষ্টান ব্যক্তিকে কেউ হত্যা করছে এবং তাকে উদ্ধারের জন্য সে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে না; আমি সত্য বলছি, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।..... আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি এবং সত্যি সত্যিই বলছি যে, আমার কোন জাতির সাথে কোন ধরণের শত্রুতা নেই। হ্যাঁ, যতদূর সম্ভব আমি তাদের সংশোধন করতে চাই। যদি আমাকে কেউ গালি দেয় তাহলে আমার অভিযোগ খোদাতা'লার দরবারে হবে কখনো জাগতিক আদালতে নয়। এবং জাতিভেদ এড়িয়ে মানবসেবা করা আমাদের অধিকার ও কর্তব্য।

(সিরাজে মুনীর রুহানী খাজায়েন দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৮)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জামাতে আহমদীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যে দশটি বয়আতের শর্ত রেখেছেন তার মধ্যে থেকে একটি শর্ত মানব সেবার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

তিনি (অঃ) বয়আতের নবম শর্তে বলেন যে, "বয়আত গ্রহণকারী তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদা প্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করবে।"

(ইস্তেহারাত তাকমিলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী ১৯৮৯)

তিনি (আঃ) নিজ পুস্তক 'পায়গামে সুলাহ্'-তে ভারতবর্ষে বসবাসকারী দু'জাতি হিন্দু ও মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলেন যে, আমাদের কর্তব্য হল সদিচ্ছ এবং স্বচ্ছ হৃদয়ে একে অপরের বন্ধু হয়ে যাওয়া এবং ধার্মিক ও জাগতিক বিপদাপদে একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। এবং এইরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করা যেন তারা একে অপরের অংশ স্বরূপ হয়ে যায়। হে দেশবাসীগণ! সেই ধর্ম ধর্ম নয় যেখানে সহানুভূতির শিক্ষা নেই। এবং সেই মানুষ মানুষ নয় যার মধ্যে সহানুভূতির শক্তি নেই।

(পায়গামে সুলাহ্ রূহানী খাজায়েন ২৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৯)

সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির ব্যাপারে আঁ-হযরত (সাঃ) সকলের উর্দ্ধে ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেন-

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে থেকে এক মহান রসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তার জন্য দুঃসহ, সে তোমাদের অতিশয় শুভাকাঙ্খী, মোমিনদের প্রতি সে পরম মমতাশীল, দয়াময়।

(সূরা তওবা: ১২৮)

সৃষ্টির প্রতি তাঁর সহানুভূতির বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন-

"আকর্ষণ শক্তি এবং সাহসীকতা কোন ব্যক্তিকে তখন প্রদান করা হয় যখন সে খোদাতা'লার ছায়াতলে এসে যায়। এবং আল্লাহতা'লার ছায়া স্বরূপ হয়ে যায়। অতঃপর সে সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও মঙ্গল কামনার্থে নিজের মধ্যে এক ব্যাকুলতা অনুভব করে। এই ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) সকল নবীগণের চেয়ে উর্দ্ধে। এই জন্য তিনি (সাঃ) সৃষ্ট জীবের কষ্টকে সহ্য করতে পারতেন না।

(আলহাকাম, ২৪শে জুলাই ১৯০২)

সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর কিছু উপদেশাবলী উপস্থাপন করছি। তিনি (আঃ) বলেন-

"আমার অবস্থা তো এই যে যদি কেউ কষ্ট অনুভব করে এবং তখন যদি আমি নামাযের অবস্থাতেও থাকি এবং তার কষ্টের শব্দ যদি কানে পৌঁছায় তখন আমি যদি নামায ছেড়ে দিয়েও তার সাহায্য করতে পারি তবে তা করবো। এবং যতদূর সম্ভব তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবো। কখনো ভাই এর বিপদাপদ দেখে তাকে সাহায্য না করা স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। যদি তোমরা তার জন্য কিছু করতে না পার তাহলে অন্ততপক্ষে দোয়া তো করতে পার। আপন তো দূরের কথা আমি তো বলি যে, শত্রু ও হিন্দুদের প্রতিও উন্নত আচরণের আদর্শ স্থাপন কর। এবং তাদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রদর্শন কর। কখনো উদাসীন হওয়া উচিত নয়। (মালফযাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৫, প্রকাশকাল ২০০৩)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, "চরিত্রই সকল উন্নতির সোপান। আমার মতে এটি বান্দাদের অধিকার প্রদানের এমন একটি দিক যা আল্লাহতা'লার অধিকার প্রদানের দিকটিকে মজবুত করে। যারা মানুষের সঙ্গে উন্নত আচরণ করে খোদাতা'লা তার ঈমানকে নষ্ট হতে দেন না। মানুষ যখন খোদাতা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে এবং নিজ দুর্বল ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে তখন তার সেই আন্তরিকতার জন্য তার ঈমান দৃঢ় হয়ে যায়। কিন্তু এটি স্মরণ রাখা উচিত যে যদি কেউ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে উন্নত আচরণ করে তবে সেই আচরণ খোদাতা'লার সন্তুষ্টির জন্য হতে পারে না এবং এতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকার কারণে কোন লাভ হয় না। এমন অনেক লোক আছে যারা সরাইখানা ও পান্থশালা তৈরী করে দেয়। কিন্তু খ্যাতি অর্জনই তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। মানুষ যদি আল্লাহ তা'লার খাতিরে কোন কাজ করে তা যতই ছোট হোক না কেন আল্লাহতা'লা তাকে বিনষ্ট করে না এবং তাকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আমি 'তাযকিরাতুল আওলিয়া' পুস্তকে পড়েছি যে একজন ওলিউল্লাহ্ বলেন একবার কয়েকদিন যাবৎ অবিরাম বৃষ্টি হতে থাকে। সেই বৃষ্টিতে এক আশি বছরের অবিশ্বাসী (অমুসলিম) বৃদ্ধকে আমি ছাদে উঠে পখিদের জন্য খাবার ছড়াতে দেখি। আমি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে অবিশ্বাসীদের কর্মের কোন মূল্য নেই- তাকে বললাম যে, তুমি কি এই কর্মের কোন সোয়াব (পুণ্য) পাবে? উত্তরে সে বলে যে, অবশ্যই পাব। সেই ওলিউল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, একবার আমি যখন হজ্জ করতে যাই তখন দেখি যে, সেই বৃদ্ধ কা'বা ঘরের তওয়াফ করছে সে আমাকে

চিনতে পারে এবং বলে যে, সেই পাখিদেরকে শস্য দানা খাওানোর জন্য পুণ্য পেয়েছি কি না? অর্থাৎ সেই পাখির খাবারই আজ তাকে ইসলাম ধর্মে অন্তর্ভুক্তির কারণ হয়েছে।

(মালফুযাত ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৬, প্রকাশকাল ২০০৩)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, "এবং মানুষের সাথে প্রকৃত সহমর্মিতার আচরণ করতে আমি উপদেশ দিচ্ছি। অন্তরকে প্রতিহিংসা থেকে মুক্ত করে ফিরিশতার মত হয়ে যাও। মানুষের জন্য সহমর্মিতার শিক্ষাহীন ধর্ম কতই না ঘৃণ্য ও অপবিত্র। সেই পথ কতই না অপবিত্র– যা স্বকপোলকল্পিত কাঁটা বিছানো! হে আমার অনুসারীরা! তোমরা এমন হয়ো না। মৃত ধর্ম থেকে তোমরা অপরের কষ্টের কারণ হওয়া ছাড়া আর কী পেতে পার? কিছুই না। অন্যদিকে প্রকৃত ধর্ম মানুষকে খোদা প্রাপ্তির পথে নিয়ে যায়। আর তা খোদার রঙে রঙিন হওয়া ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। খোদার খাতিরে সবার প্রতি রহম কর, যেন উর্ধ্বলোক থেকে তোমার প্রতি রহমত বর্ষিত হয়। এস! আমি তোমাদের সেই পথের সন্ধান দিব– যা অনুসরণ করলে তোমাদের আলো (নুর) অন্য সব আলোকে ম্লান করে দিবে। আর তা হল, তোমার সকল প্রকার হীন স্বার্থ ও জিঘাংসা পরিত্যাগ করে মানুষের প্রতি সহমর্মী হও"

(গভর্ণমেন্ট ইংরেজী আওর জেহাদ, রূহানী খাজায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্টা: ১৪)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন-

" আমি দেখছি এমন অনেক লোক আছে যাদের মধ্যে নিজ ভায়ের জন্য কোন সহানুভূতির চিহ্ন নেই। এক ভাই অনাহারে মারা গেলেও তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই এবং কেউ তার খেয়াল রাখার জন্যও প্রস্তুত নয় অথবা যদি কেউ অন্য কোন বিপদাপদের সম্মুখিন হয় তার জন্য নিজ সম্পদ থেকে কিছুটা ব্যয় করার মত অনুগ্রহও করে না। হাদীসে তো প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখা এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে এমনকি এই আদেশও রয়েছে যে, যদি তুমি মাংস রান্না কর সেখানে তুমি ঝোল বেশী রাখ যেন তার মধ্যে থেকে তাকেও কিছুটা দিতে পার। কিন্তু এখন নিজেরাই নিজেদের উদরপূর্তি করে চলেছে, কিন্তু প্রতিবেশীদের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। একথা কখনো ভেবনা যে, প্রতিবেশী বলতে কেবল বাড়ির আশেপাশে বসবাসকারীদেরকে বোঝানো হয়, বরং তোমাদের নিজের ভাইও প্রতিবেশীদের অন্তর্ভুক্ত, তারা যতই দূরে থাকুক না কেন ।

(মালফুযাত ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৫, প্রকাশকাল ২০০৩)

তাঁর অন্তর মানুষের প্রতি ভালবাসার অনুভূতিতে এমন পরিপূর্ণ ছিল যার উদাহরণ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি (আঃ) নিজের এই ভালোবাসার অনুভূতিকে এইরূপ ব্যক্ত করেন-

" জগতে কারো সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই আমি মানুষকে এইরূপ ভালোবাসি যেভাবে মা নিজ সন্তানকে ভালোবাসে এমনকি এর চেয়েও বেশি। আমি শুধু সেইসব বাতিল আকিদা সমূহের শত্রু যার মাধ্যমে সত্যের কণ্ঠরোধ হয়। মানুষের প্রতি সহানুভূতি তো আমার কর্তব্য এবং মিথ্যা, শির্ক, অনাচার ও সকল কুকর্ম, অন্যায় এবং দুর্বৃত্তির প্রতি বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করা হল আমার রীতি।

(আরবাঈন রূহানী খাজায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৪)

তিনি (আঃ) বলেন যে, আল্লাহতা'লা সূরা ফাতেহাকে এইজন্য অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে সর্বপ্রথম যে গুণের কথা বর্ণিত হয়েছে তা হল 'রব্বুল আলামীন' যার মধ্যে সকল সৃষ্ট জীব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন মোমিনের সহানুভূতি প্রথমতঃ এত বিস্তৃত হওয়া উচিত যেন সকল জীবজন্তু ও সমস্ত সৃষ্ট জীব এর মধ্যে এসে যায়। এবং এরপর দ্বিতীয় সিফাত আর রহ্মান বলে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে এই শিক্ষাই রয়েছে যে, বিশেষ করে সকল প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিত। এরপর আর্ রহিম এর মধ্যে মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের শিক্ষা রয়েছে। মোটকথা সূরা ফাতেহার মধ্যে আল্লাহতা'লার যেসব গুণাবলীর কথা উল্লেখ হয়েছে সেসব আসলে খোদাতা'লার চরিত্র, যেখান থেকে বান্দাদের অংশ নেওয়া উচিত। আর এটি এভাবে সম্ভব যে যদি কেউ সুস্থ অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে স্বজাতির প্রতি যথা সম্ভব সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিত। যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি তার কোন আত্মীয় ও বন্ধু হয়ে থাকে বা যে কেউ হোক না কেন তার সম্পর্কে উদাসীনতা প্রকাশ করা উচিত নয় এবং তাদের সঙ্গে অপরিচিতদের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত নয় বরং তাদের সেইসব অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত যা (অধিকার) তোমাদের উপর রয়েছে। যদি তার কারোর সহিত বন্ধুত্ব থাকে তার উপর অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার তাকে প্রদান করা উচিত।

(মালফুযাত ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৬২, প্রকাশকাল ২০০৩)

তিনি (আঃ) বলেন-

"আল্লাহতা'লার পথে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করা প্রকৃতপক্ষে যা ইসলাম তা দুই ধরনের হয়ে থাকে প্রথমতঃ সে নিজে যেন খোদা তা'লাকেই নিজের মাবুদ, ঠিকানা এবং প্রেমী বলে মনে করে"।

আর দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে তিনি বলেন-

" আল্লাহ তা'লার পথে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করার দ্বিতীয় প্রকার হল তার বান্দাদের সেবা, তাদের প্রতি সহানুভূতি, সাহায্য, তাদের দুঃখ মোচনের উদ্দেশ্যে নিজ জীবন উৎসর্গ করা। অপরের সুখ-সাচ্ছন্দের জন্য নিজে কষ্ট সহ্য কর এবং দুঃখ ও বেদনা সহ্য কর।"

(আইনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাজায়েন ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬০)

তিনি (আঃ) বলেন-

" সৃষ্টির এইরূপ সেবা কর যতটুকু এক সৃষ্টির প্রয়োজন। এবং যা বিভিন্ন প্রয়োজন ও পদ্ধতিতে খোদাতা'লা একজনকে অপরের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছেন, সেই সমস্ত বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'লার খাতিরে নিজের সেই প্রকৃত ও নিঃস্বার্থ সহানুভূতির মাধ্যমে তাদের কল্যাণ সাধন করা উচিত যা তার নিজের উপর প্রকাশ করা সম্ভব। এবং সমস্ত অসহায়দেরকে খোদা প্রদত্ত নিজ শক্তি দ্বারা সাহায্য করা এবং তাদের ইহকাল ও পরকালের সংশোধনের জন্য চেষ্টায় রত থাকা উচিত।

(আইনায়ে কামালাতে পৃষ্ঠা: ৬১-৬২)

সৃষ্ট জীবের সংশোধন এবং তাদের সহানুভূতির জন্য তিনি (আঃ) যে কতটা বিচলিত থাকতেন তা দেখা খুবই কষ্টকর বিষয় ছিল। যখন পাঞ্জাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং অসংখ্য লোক এই মারণ রোগে মৃত্যুবরণ করছিল, সেই সময় সহানুভূতির আবেগ ও অনুভূতিতে তাঁর যে কি অবস্থা ছিল সে সম্পর্কে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রাঃ) বলেন যে, তিনি মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে নিভৃতে দোয়া করতে শুনেছেন এবং সেই দৃশ্য দেখে তিনি বিস্ময়াভিভুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন-

" তাঁর এই দোয়ায় এত বেদনা ছিল যে, শ্রবনকারী বিগলিত হয়ে পড়ে। তিনি (আঃ) আল্লাহ তা'লার দরবারে এরূপ অনুনয় বিনয় করছিলেন যেভাবে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা প্রসব বেদনায় অস্থির হয়ে ওঠে। আমি খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছি। তিনি (আঃ) খোদার সৃষ্টিকে প্লেগের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য দোয়া করছিলেন এবং বলছিলেন যে, হে খোদা! যদি এরা প্লেগের আযাবে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তোমার উপাসনা কে করবে? (সীরাতে তৈয়্যেবাহ্ পৃষ্ঠা: ৫৪, সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সুমাইল ও আখলাক ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৫, সেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানীর লেখনী)

তিনি (আঃ) বলেন- " এটি সত্য কথা যে, যে ব্যক্তি চায় যে, তার কারণে অপর একজনের মঙ্গল হোক তাহলে সে যেন ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে। যদি সে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে থাকে তাহলে তার দ্বারা অপরের কি কল্যাণ সাধন হতে পারে, যেখানে নিজ কামনা বাসনা ও চিন্তাধারার বিপরীতে সামান্য কিছু ঘটলেই সে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হয়? তাকে তো এইরূপ হতে হবে যে, যদি তাকে হাজার হাজার অস্ত্র দিয়েও আঘাত করা হয় তবু যেন সে তার কোন ভ্রুক্ষেপ না করে।

আমার নসিহত এই যে, দুটো কথা স্মরণ রেখো। প্রথমতঃ খোদাকে ভয় করো এবং দ্বিতীয় নিজ ভাইয়ের প্রতি এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন কর যা তুমি নিজের প্রতি করে থাকো। যদি কেউ ভুল কের ফেলে তাহলে তাকে ক্ষমা করা উচিত। তার উপর আরো চাপ সৃষ্টি করা এবং শত্রুতা পোষণ করার অভ্যাস বানিয়ে নেওয়া উচিত নয়।

মানুষের প্রবৃত্তি তাকে বাধ্য করে যে তার বিরুদ্ধে যেন কোন কিছু না ঘটে। যার ফলশ্রুতিতে সে চায় যে সে যেন আল্লাহ তা'লার আসনে আসীন হতে পরে। এজন্য এর থেকে বিরত থাক। আমি সত্যিই বলছি যে, বান্দাদের প্রতি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করাও এক প্রকার মৃত্যু। সামান্য তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রেও নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করাকে আমি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখি। আমি তো এটি পছন্দ করি যে যদি কেউ সামনেও গালাগালি করে সেখানে

ধৈর্য ধারণ করে সে নীরব থাকে।

(মালফুযাত ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৯, প্রকাশকাল ২০০৩)

তিনি (আঃ) বলেন-

"একদিন আমি বাইরে ঘুরতে যাচ্ছিলাম আব্দুল করীম নামের একজন চৌকিদারও আমার সঙ্গে ছিল। সে একটু আগে এবং আমি একটু পিছনে ছিলাম রাস্তায় সত্তর পঁচাত্তর বছর বয়সের এক বৃদ্ধা মহিলার সাথে সাক্ষাত হয় সে একটা চিঠি তাকে (চৌকিদারকে) পড়তে বলে কিন্তু সে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। তা দেখে আমার অন্তরে আঘাত লাগে তখন সেই মহিলা চিঠিটা আমাকে দেয় আমি সেই চিঠিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাই এবং চিঠিটা পড়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিই। এ দেখে সেই চৌকিদার লজ্জিত হয়ে যায়, কেননা দাঁড়াতে তো হলই এবং পুণ্য থেকেও বঞ্চিত হতে হল। (মালফুযাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৫, প্রকাশকাল ২০০৩)

গরীব দুঃস্থ ও অসুস্থদের জন্য তাঁর রহমতের ঝর্ণা সর্বদা প্রবাহিত থেকেছে। সৃষ্টির প্রতি গভীর সহানুভুতি প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের দৃষ্টিতে দেখা একটি ঘটনা হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেহ সিয়ালকুটি (রা.) বর্ণনা করেন-

একদিন অনেকজন গ্রাম্য মহিলা তাদের অসুস্থ শিশুদেরকে চিকিৎসার জন্য আসে। ইতিমধ্যে ঘর থেকেও কিছু সেবিকাও শরবতের জন্য বাসন হাতে পৌঁছায়। সেই সময় কোন ধার্মিক প্রয়োজনীয়তার জন্য এক বিশেষ প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ঘটনাক্রমে আমিও সেখানে পৌঁছে যাই। গিয়ে দেখি তিনি (আ.) প্রস্তুত হয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যেভাবে কোন ইউরোপবাসী নিজের ডিউটিতে তৎপর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তিনি পাঁচ-ছয়টা বাক্স খুলে রেখেছেন। এবং ছোট ছোট বোতল ও শিশি থেকে সকলকে বিভিন্ন প্রকার ঔষধ দিচ্ছেন। তিন ঘন্টা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া এবং হাসপাতাল চলতে থাকে। কাজ শেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, হুযুর! এটা তো খুবই কষ্টের কাজ। এবং এভাবে তো অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্ আল্লাহ্! কত স্ফুর্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি উত্তর দেন যে, এটিও তো ধর্মের কাজ। এরা অভাবী ও দুঃস্থ লোক। এখানে কোন হাসাপাতাল নেই। আমি এদের জন্য সমস্ত ইংরেজি এবং ইউনানী ঔষধ কিনে রেখে দিই যা সময়ে কাজে লাগে। এটি বড়ই পুণ্যের কাজ। মোমিনদেরকে এইসব কাজে অলসতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

(সীরাত হযরত মসীহ মওউদ আ., হযর আব্দুল করীম সাহেবের লেখনী, পৃষ্ঠা: ৩৬)

"কাদিয়ানে নাহাল সিং নামক এক জাঠ ছিল সে জামাতের শত্রু ছিল। এবং তার আন্দোলনেই হযরত হাকিমুল উম্মত এবং অন্যান্য লোকজনও আহমদীদের উপর এক মারাত্মক ফৌজদারী মিথ্যা মকদ্দমা চালায় এবং সে সর্বদা অন্যান্য লোকজনকে সাথে নিয়ে আহমদীরেকে বিরক্ত করত। এবং গালাগালি করা তো তার প্রতিদিনের অভ্যাস ছিল। ঠিক সেই দিনগুলোতে যখন মকদ্দমা চলছিল তার ভাইপো সন্তা সিং এর স্ত্রীর জন্য মেশকের প্রয়োজন ছিল যা অন্য কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। আর যদিও বা পাওয়া যেত তা খুবই মূল্যবান জিনিস ছিল এই অবস্থায় সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর ঘরে গিয়ে মেশকের আবদার জানায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তার শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তাকে সামান্যতম ও অপেক্ষা না করিয়ে তার আবদার শুনেই তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতরে যান এবং বলেন যে, দাঁড়াও এখনই আমি নিয়ে আাসছি, সুতরাং তিনি (আঃ) আধা তলার মত মেশক নিয়ে এসে তাকে দিয়ে দিলেন।

(সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানীর লেখনী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৬)

সহানুভূতি ও মানব সেবার বিষয়ে তিনি (আঃ) বলেন যে, আমি সত্যি সত্যিই বলছি যে, মানুষের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের উপর নিজের ভাইকে সুখ-স্বাচ্ছন্দকে প্রাধান্য দেয়। যদি আমার কোন এক ভাই আমার সামনে দুর্বলতা ও অসুস্থতা সত্বেও মাটিতে শোয় আর আমি সুস্থ থাকা সত্বেও এই উদ্দেশ্যে খাট দখল করে থাকি যে সে উপরে বসতে না পারে, তাহলে আমার এই অবস্থার উপর আক্ষেপ যে, যদি আমি না উঠি এবং ভালবাসা ও সহানুভুতি বশতঃ নিজের চৌকি তাকে না দিই এবং নিজের জন্য মাটির বিছানাকে পছন্দ না করি। যদি আমার কোন ভাই অসুস্থ থাকে এবং কোন যন্ত্রনায় অস্থির থাকে আর আমি যদি তার এই অবস্থা দেখেও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকি এবং তার কষ্ট লাঘবের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করি তবে আমার জন্য ধিক্কার। ..... ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ প্রকৃত মোমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হৃদয় কোমল হয়। ..... জাতির সেবক হওয়া সেবিত হওয়ার পরিচায়ক এবং দরিদ্রের সাথে কোমল ও নমনিয়তার সঙ্গে কথা বলা আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণীয়তার লক্ষণ এবং পুণ্যের মাধ্যমে অনাচারের উত্তর দেওয়া সৌভাগ্যের লক্ষণ এবং ক্রোধ সংবরণ করা এবং কটু কথা হজম করে নেওয়া উচ্চ মার্গের বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচায়ক।"

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৫)

তিনি বলেন-

" স্মরণ রেখো! সহানুভুতির সীমা আমার নিকট অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। কোন জাতি ও মানুষকে পৃথক করা উচিত নয়। আমি বর্তমান যুগের অজ্ঞদের ন্যায় একথা বলতে চাই না যে, তোমরা নিজেদের সহানুভুতিকে কেবল মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখ। না! আমি তোমাদেরকে হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে খোদা তা'লা সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভুতিশীল হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। আমি কখনও সেই সব লোকদের কথা পছন্দ করি না যারা সহানুভুতিকে কেবল স্বজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করতে চায়।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৭)

আল্লাহ্ তা'লার অধিকার ও বান্দাদের অধিকার প্রদানের জন্য মানুষের সবসময় প্রস্তুত থাকা উচিত। যে ব্যক্তি বান্দাদের অধিকার প্রদান করে না সে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার কি করে প্রদান করতে পারে? এই বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"স্মরণ রেখো! একজন মুসলমানকে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার ও তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। যেভাবে সে মুখে আল্লাহ্ ও তাঁর গুণাবলীকে এক-অদ্বিতীয় মনে করে তা যেন তার কার্যকলাপের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভুতি ও কোমলতার আচরণ করা উচিত এবং নিজ ভাইদের প্রতি কোন ধরণের ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয় এবং পরচর্চা এবং পর নিন্দা থেকে সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে পৃথক রাখা উচিত। কিন্তু আমি দেখছি যে, এই বিষয়টি তো এখনও অনেক দূরে রয়েছে। তোমরা খোদাতে এমন বিলীন হয়ে যাও যেন কেবল তাঁরই হয়ে যাও এবং যেভাবে মুখে স্বীকার কর অনুরূপভাবে কার্যকলাপেও তা প্রকাশ কর। এখনও পর্যন্ত তোমরা সৃষ্টির অধিকারকেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করতে পার নি। অনেকেই এমন রয়েছে, যারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও শত্রুতা পোষণ করে এবং নিজেদের চেয়ে দুর্বল ও দরিদ্রদেরকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে এবং তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, পরস্পরের নিন্দা করে বেড়ায় এবং অন্তরে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। কিন্তু খোদা তা'লা বলেন, তোমরা পরস্পরের মধ্যে একক সত্ত্বায় পরিণত হও আর এমনটি হলে আমি বলতে পারব যে, তোমরা আত্মশুদ্ধি করতে পেরেছ। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিজের পরস্পরের মধ্যে স্বচ্ছতা না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত খোদা তা'লার সঙ্গেও তোমার সম্পর্ক সুস্পষ্ট হবে না। অতএব এই দুই ধরণের অধিকারের মধ্যে খোদা তা'লার অধিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সৃষ্টির প্রতি তার আচরণ এক আয়না স্বরূপ, যে ব্যক্তি নিজ ভাইদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে না, সে আল্লাহ্ তা'লার অধিকারও প্রকৃত অর্থে প্রদান করতে সক্ষম নয়। "

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৭)

তিনি আরও বলেন- "শরিয়তের মূলত দুটি অংশ রয়েছে যেগুলি রক্ষা করা মানুষের জন্য আবশ্যক। প্রথমঃ আল্লাহ্‌র অধিকার এবং অপরটি হল বান্দাদের অধিকার। আল্লাহ্ তা'লার অধিকার হল তাঁর ভালবাসা, আনুগত্য, উপাসনা, একত্ববাদ এবং তাঁর গুণাবলীতে অন্য কাউকে শরিক না করা। বান্দাদের অধিকার হল নিজ ভাইয়ের প্রতি অহংকার, বিশ্বাসঘাতকতা এবং কোন প্রকারের অত্যাচারপূর্ণ আচরণ যেন না করা হয়। অর্থাৎ আচরণের দিক থেকে কোন প্রকারের ত্রুটি যেন না থাকে। শুনতে তো দুটি বাক্য মাত্র। কিন্তু এগুলিকে বাস্তবায়িত করা অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। নিজ বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপা থাকলে তবেই এর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। কারোর মধ্যে ক্রোধশক্তি অতি মাত্রায় থাকে। যখন সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তখন তার অন্তর ও মুখ কোনটিই পবিত্র থাকতে পারে না। সে অন্তরে নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে

দুষ্ট পরিকল্পনা তৈরী করে আর মুখে গালি দেয় এবং বিদ্বেষ পোষণ করে। কারোর মধ্যে পুরুষত্ব বেশি থাকে এবং সে এরই দাসত্ব করে আল্লাহ্‌র সীমা লঙ্ঘন করে। মোটকথা যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের নৈতিক অবস্থার পরিপূর্ণ সংশোধন না হয় সেই পূর্ণ ঈমানে প্রবেশ করতে পারে না যা পুরস্কৃতদের অন্তভুক্ত করে এবং যার মাধ্যমে প্রকৃত মারেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতিঃ সৃষ্টি হয়। অতএব অহরাত্রি এই প্রচেষ্টা থাকা উচিত যে, মানুষ প্রকৃত একশ্বেরবাদী হওয়ার পূর্বে যেন নিজের চরিত্র সংশোধন করে। ”

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৪)

মানবজাতির প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শনের বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আরও কয়েকটি উপদেশাবলী উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন-

“প্রত্যেক মানুষকে প্রত্যেক দিন আত্ম-জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, এই সব বিষয়াদিকে সে কতটা গুরুত্ব দেয় এবং সে নিজ ভাইয়ের প্রতি কতটা সহানুভুতি প্রদর্শন করে। এই বিষয়ে মানুষের উপর এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লা বলবেন- আমি অভুক্ত ছিলাম, তুমি আমাকে আহার করাও নি। আমি পিপাসার্ত ছিলাম তুমি আমাকে পানি পান করাও নি। আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমার শুশ্রুষা কর নি। যাদেরকে এই প্রশ্ন করা হবে তারা আল্লাহ্ তা'লাকে বলবেন হে খোদা! তুমি হবে অভুক্ত ছিলে যে আমরা তোমাকে আহার করাই নি? তুমি কবে পিপাসার্ত ছিলে যে আমরা তোমাকে পানি দিই নি? আর কবে তুমি অসুস্থ ছিলে যে আমরা তোমার সেবা করি নি? তখন আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, আমার অমুক বান্দার এই সব জিনিসের প্রয়োজন ছিল কিন্তু তোমরা তার প্রতি কোন সহানুভুতি দেখাও নি। তার প্রতি সহানুভুতিশীল হওয়া আমার প্রতি সহানুভুতিশীল হওয়ার ন্যায় ছিল। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা আরও একটি জামাতকে বলবেন যে, সাবাস! তুমি আমার প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করেছ, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে অন্ন দিয়েছ, আমি পিপাসার্ত ছিলাম তুমি আমাকে পানি পান করিয়েছ ইত্যাদি। তখন সে বলবে যে, হে প্রভু! আমরা কখন তোমার প্রতি এরূপ আচরণ করেছি? তখন আল্লাহ্ তা'লা উত্তরে বলবেন যে, আমার অমুক বান্দার সাথে তোমরা সহানুভুতি প্রদর্শন করেছ যা কি না আমার প্রতিই সহানুভুতি ছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করা খুবই কঠিন কাজ, তবে খোদা তা'লা এই কাজ অত্যন্ত পছন্দ করেন। এর চায়তে উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে যে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি সহানুভুতিশীল হয়েছে। সাধারণত জাগতিক নিয়মেও এমন হয়ে থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তির ভৃত্য তার বন্ধুর কাছে যায় আর সে ভৃত্যকে কুশলবার্তা সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা না করে তাইলে কি সেই ভৃত্যের মালিক বন্ধুর এমন আচরণে কি প্রীত হবে? কখনও না। অথচ সে তো তাকে কোন কষ্ট দেয় নি। কিন্তু তবু না। সেই ভৃত্যের আদর আপ্যায়ন এবং তার সঙ্গে উত্তম আচরণ বস্তুতঃ তার মালিকের সঙ্গে উত্তম আচরণের নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির সঙ্গেও আচরণে কেউ এমন শিথিলতা প্রদর্শন করাকে তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন, কেননা, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে অত্যন্ত ভালবাসেন। অতএব যে ব্যক্তি খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ সে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করে।”

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৫)

তিনি আরও বলেন-

“স্মরণ রেখো! নিজ ভাইয়ের প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভুতিশীল হওয়া কোন সহজ কাজ নয় বরং তা খুবই কঠিন কাজ। কপটতার সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা ভিন্ন বিষয়, কিন্তু সত্য প্রেম ও সহানুভুতি প্রদর্শন করা এক ভিন্ন বিষয়। স্মরণ রেখো! যদি এই জামাতের মধ্যে সহানুভুতি না থাকে তাহলে এটি ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং খোদা তা'লা এর জায়গায় অন্য কোন জামাত তৈরী করে নিবেন। .... স্মরণ রেখো! এটি খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি যে, পবিত্র ও অপবিত্র কখনো একত্রে থাকতে পারে না। অতএব এখনও সময় আছে নিজেদের সংশোধন করে নাও। স্মরণ রেখো! মানুষের অন্তর খোদার ঘরের ন্যায়। মানুষের ঘর এবং খোদার ঘর এক হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ নিজ অন্তরকে পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ করে এবং নিজ ভাইদের জন্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হতে পারে না। ”

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৮)

প্রিয় পাঠকবর্গ! মানবসেবা এবং সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করার এই শাশ্বত শিক্ষা শুধু মাত্র ইসলাম ধর্ম প্রদান করেছে। এবং হযরত মহম্মদ (সা.) ও তাঁর একনিষ্ঠ প্রাণদাস হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেখিয়েছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও এর অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। মানব সেবার কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে জামাতে আহমদীয়া নিজেদের ইমামের দিক-নির্দেশনায় অগ্রসর হচ্ছে না। অতএব আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়ার আবেদন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে খিলাফতে আহমদীয়ার পথ-নির্দেশনায় মানবতার সেবা করার সৌভাগ্য দান করেন। আমীন।

# সালাম

**এবং যখন ঐ সকল লোক তোমার নিকট আসে যারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, তখন তুমি বল, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক”**

**(আল-আনআম, আয়াত: ৫৫)**

**এবং যখন তোমাদেরকে সাদর-সম্ভাষণে সম্বোধন করা হয়, তখন তোমরা উহা হতে উৎকৃষ্টতর সাদর-সম্ভাষণ জানিও অথবা কমপক্ষে তা-ই প্রত্যার্পণ করিও; নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে গ্রহণকারী।”**

**(সূরা নিসা, আয়াত: ৪)**

## বদর পত্রিকা নিজেও পড়ুন এবং বন্ধু-বান্ধবদের পড়ার জন্য ইসু করান।

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বদর পত্রিকার ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের বিশেষ সংখ্যার জন্য তাঁর বার্তা প্রেরণ করে বলেন-

“ বদর পত্রিকার পাঠকদেরকে একথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এই পত্রিকা জামাতের সদস্যদের আধ্যাত্মিক সংশোধন ও উন্নতির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছিল আর আমাদের পূর্বজরা প্রতিকুল অবস্থায় পূর্ণ নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণা নিয়ে এটিকে চিরকাল অব্যাহত রাখার চেষ্টা ও সংকল্প নিয়েছিলেন। তাঁদেরই দোয়া ও একনিষ্ঠ সাধনার কল্যাণে আজও এই পত্রিকা অব্যাহত রয়েছে। এটি এবিষয়ের দাবি করে যে, সমধিক আহমদী সদস্যরা যেন এই পত্রিকা পাঠ করে তা থেকে উপকৃত হয়। আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপাগুণে বিশেষ করে ভারতের আহমদী এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বসবাসকারী আহমদীদেরকে এই পত্রিকা অধ্যয়ন করার এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আশিসসমূহ অর্জন করার তৌফিক দান করুন। আমীন”।

সৈয়্যাদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নির্দেশের আলোকে ভারতের জামাতগুলির সদস্যবর্গের কাছে আবদেন করা হচ্ছে যে, প্রত্যেকটি পরিবারে বদর পত্রিকা পাঠ সুনিশ্চিত করা অতি আবশ্যক। এই পত্রিকায় কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী ছাড়াও হুযুর আনোয়ার (আই.) খুতবা ও ভাষণাদি এবং বিভিন্ন দেশে তাঁর পরিভ্রমণের ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট নিয়মিত প্রকাশিত হয় যেগুলি পড়া প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন এই পত্রিকা হিন্দি, বাংলা, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম এবং উড়িয়া ভাষাতেও প্রকাশিত হচ্ছে। যে সমস্ত সদস্যরা পত্রিকা নিজেদের নামে চালু করেন নি, তাদের কাছে আবেদন করা হচ্ছে যে, বদর পত্রিকা চালু করে নিজেও পড়ুন এবং সন্তান-সন্ততি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকেও পড়ার সুযোগ করে দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশ মেনে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন।

পত্রিকা না পাওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ বা চাঁদা পরিশোধের বিষয়ে তথ্য জানতে নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন। ( নওয়াব আহমদ, ম্যানেজার বদর পত্রিকা)

+91 1872-224 -757 +91 9417 020 616

Email: managerbadrqnd@gmail.com

পার্লামেন্ট হোক বা জার্মানীর মিলিটারী হেড কোয়ার্টার, আফ্রিকার দেশ হোক বা অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ, সিঙ্গাপুর হোক বা নিউজিল্যান্ড, ফিজি হোক জাপান তিনি স্বয়ং নিজেই বিশ্বের দেশগুলিতে গিয়ে যখন সেখানকার নেতা, বুদ্ধিজীবি এবং বিভিন্ন দেশের রেডিও, টিভি এবং পত্রপত্রিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতকারে অতি সহনশীলতা ও সাহসিকতার সাথে প্রজ্ঞাপূর্ণ ভঙ্গিতে জিহাদের বিষয়ে মুসলিম ও অ-মুসলিমদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে পবিত্র কুরআনের প্রকৃত, সুস্পষ্ট, পবিত্র এবং শান্তিপূর্ণ শিক্ষাগুলি উপস্থাপন করেন তখন প্রত্যেক পুণ্যবান এবং শান্তি সন্ধানী মানুষ একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, ইসলাম কখনোই সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা দেয় না। বরং এটি একটি পরপূর্ণ শান্তির ধর্ম এবং এটি হল সেই পথ যার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জগতের সকল আঞ্চলিক, জাতিগত এবং ধর্মীয় বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্বের অবসান ঘটিয়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

এই বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বক্তব্য এবং বিশ্বের পরাশক্তি ও বিশেষ কিছু দেশ ও ধর্ম নেতাদের নামে চিঠির সারাংশ আকারে একটি বিশেষ পুস্তক World Crisis and pathway to Peac নামে প্রকাশিত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) নিজ খিলাফত কালে প্রাথমিক দিনগুলিতেই এই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং একাধিক খুতবা ও ভাষণের মাধ্যমে আপন পর সকলকে ইসলামের শান্তিপ্রিয় শিক্ষা এবং জিহাদের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি জামাতের সদস্যদেরকেও এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, ইসলামের শান্তিপ্রিয় শিক্ষাকে যেন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর ঐশী পথনির্দেশনায় বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত একনিষ্ঠভাবে জনগণের প্রতি বিশেষ সহানুভুতি নিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রাণান্ত চেষ্টায় রত আছে।

আমাদের আহমদীদের কতর্ব্য হল আমরা যেন নিজ ইমামের পদাঙ্ক অনুসরণে এই মহান লক্ষ্যে পূর্ণোদ্দমে অংশ গ্রহণ করি এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষাকে শুধু মাত্র নিজেদের উপরই যেন অনিবার্য না করি বরং অপরকেও যেন ইসলামের শান্তিপূর্ণ বেষ্টনীতে আসার আমন্ত্রণ জানাই। যেন জগতের সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, নৈরাজ্য ও হানাহানির চিরবসান ঘটে এবং সারা জগত যেন শান্তিময় হয়ে ওঠে।

১৪-এর পাতার পর.....

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত জাফর বিন আবু তালেব (রা.) মিসকীনদের খুব ভালবাসতেন এবং তাদের সঙ্গে বসতেন এবং কথা বলতেন। তারাও তাঁর সঙ্গে কথা বলত। মহানবী (সা.) তাঁকে আবুল মাসাকীন নামে ডাকতেন।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- হে আল্লাহ্ আমাকে মিসকীন অবস্থায় জীবিত রাখ এবং মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান কর আর আমাক কিয়ামতের দিন মিসকীনদের দলে উত্থিত করো। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল এমন দোয়া কোন চাইছেন? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন- মিসকীনরা ধনীদের থেকে চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা! কোন খেজুরের একটি টুকড়ো দিতে হলেও কোন মিসকীনকে কখনো তিরস্কার করো না। হে আয়েশা! মিসকীনদেরকে সবসময় প্রিয় জ্ঞান করো তাদেরকে নিজের নৈকট্য দিও, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'লাও তোমাকে নিজ নৈকট্য প্রদান করবেন।

(তিরমিযী কিতাবুয যোহদ)

এখানে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর কোন কোন বর্ণনায় শত শত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশের উল্লেখ রয়েছে। এটি একটি রূপকভাষা। চল্লিশ হোক বা শত শত-এর দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, গরীবরা অন্যদের তুলনায় সহজে ক্ষমা লাভ করবে আর আল্লাহ তা'লা তাদের প্রতি সদয় হবেন। এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়। আঁ হযরত (সা.)-এর অন্তর গরীব দুখীদের সঙ্গে আছে তখন তো তাঁর কল্যাণেই গরীবদের মুক্তিলাভ হবে।

এই কয়েকটি হাদীস আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছি, কেননা ঈদ উপলক্ষ্যে বিশেষ করে এই কথা স্মরণ করানোর প্রয়োজন পড়ে আর আমি সব সময় স্মরণ করিয়ে থাকি যে, নিজের দরিদ্র প্রতিবেশী, অসহায় ও দুঃস্থ মানুষদের ঈদকে আনন্দময় করে তুলুন তবেই আপনি ঈদ উদযাপন করতে পারবেন। তাদের ঈদ আনন্দময় করে তুললে আল্লাহ্ তা'লা আপনার ঈদ আনন্দময় করে তুলবেন। এর মধ্যে প্রজ্ঞার বিষয় রয়েছে এবং অনেক গভীর রহস্য অন্তর্নিহিত রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত আহমদীয়ার সদস্যদরে মধ্যে নিজের গরীব ভাইদের অসাধারণ সেবা করার এই অভ্যাস গড়ে উঠছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" যদি আল্লাহ্ তা'লাকে সন্ধান করতে হয় তবে মিসকীনদের অন্তরের কাছে সন্ধান কর। এই কারণেই পয়গম্বররা মিসকীনীর পোশাক পরিধান করেছিলেন। অনুরূপভাবে ধনী জাতির মানুষেরা যেন দরিদ্র জাতিগুলিকে উপহাস না করে। আর কেউ যেন নিজের বংশ পরিচয় নিয়ে গর্ব না করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যখন আমার কাছে উপস্থিত হবে তখন এ প্রশ্ন করব না যে, তোমার জাতি কি, বরং আমি তোমাদের কর্মের বিষয়ে প্রশ্ন করব। অনুরূপভাবে খোদার রসূল তাঁর কন্যা ফাতেমা (রা.) কে বলেন-হে ফাতিমা! খোদা তা'লা জাতি বা বংশ পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন করবেন না। যদি তুমি কোন মন্দ কাজ কর, তবে রসূলের কন্যা বলে খোদা তা'লা তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন না। অতএব, তোমাদের প্রত্যেককে সব সময় নিজেদের কর্মের বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত। "

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭০)

তিনি আরও বলেন-

" বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করা খুবই কঠিন কাজ, তবে খোদা তা'লা এই কাজ অত্যন্ত পছন্দ করেন। এর চায়তে উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে যে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি সহানুভুতিশীল হয়েছে। সাধারণত জাগতিক নিয়মেও এমন হয়ে থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তির ভৃত্য তার বন্ধুর কাছে যায় আর সে ভৃত্যকে কুশলবার্তা সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা না করে তাইলে কি সেই ভৃত্যের মালিক বন্ধুর এমন আচরণে কি প্রীত হবে? কখনও না। অথচ সে তো তাকে কোন কষ্ট দেয় নি। কিন্তু তবু না। সেই ভৃত্যের আদর আপ্যায়ন এবং তার সঙ্গে উত্তম আচরণ বস্তুতঃ তার মালিকের সঙ্গে উত্তম আচরণের নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির সঙ্গেও আচরণে কেউ এমন শিথিলতা প্রদর্শন করাকে তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন, কেননা, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে অত্যন্ত ভালবাসেন। অতএব যে ব্যক্তি খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ সে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করে।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৫)

অতঃপর তিনি বলেন-

" মোটকথা মানবজাতির উপর সদয় ও সহানুভুতিপূর্ণ আচরণ অনেক বড় ইবাদত আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে এই প্রেক্ষিতে বড়ই দুর্বলতা প্রদর্শন করা হয়। অপরকে হেয় জ্ঞান করা হয়, তাদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়। তাদের খোঁজ খবর নেওয়া এবং কোন বিপদাপদে সাহায্য করা অনেক বড় বিষয়। যারা দরিদ্র মানুষের প্রতি সদাচারী নয় বরং তাদেরকে হেয় জ্ঞান করে, আমি তাদের নিজেদেরই এই বিপদের সম্মুখীন হওয়া নিয়ে আশঙ্কিত। আল্লাহ্ তা'লা যাদের উপর কৃপা করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তারা যেন তাঁর সৃষ্টির প্রতি হিতৈষী হয় এবং সেই খোদা প্রদত্ত কৃপা নিয়ে গর্বিত না হয় আর পশুদের মত দরিদ্রদেরকে পদদলিত না করে।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩৮-৪৩৯)

তিনি আরও বলেন-

" আমি দেখছি এমন অনেক লোক আছে যাদের মধ্যে নিজ ভাইয়ের জন্য কোন সহানুভূতির চিহ্ন নেই। এক ভাই অনাহারে মারা

জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যকে ২০১৭ সালের কাদিয়ান জলসা সালানার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

দোয়াপ্রার্থী:

গোলাম মোস্তাফা, আমীর জেলা জামাত আহমদীয়া মুর্শিদাবাদ

গেলেও তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই এবং কেউ তার খেয়াল রাখার জন্যও প্রস্তুত নয় অথবা যদি কেউ অন্য কোন বিপদাপদের সম্মুখিন হয় তার জন্য নিজ সম্পদ থেকে কিছুটা ব্যয় করার মত অনুগ্রহও করে না। হাদীসে তো প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখা এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে এমনকি এই আদেশও রয়েছে যে, যদি তুমি মাংস রান্না কর সেখানে তুমি ঝোল বেশী রাখ যেন তার মধ্যে থেকে তাকেও কিছুটা দিতে পার। কিন্তু এখন নিজেরাই নিজেদের উদরপূর্তি করে চলেছে, কিন্তু প্রতিবেশীদের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। একথা কখনো ভেবনা যে, প্রতিবেশী বলতে কেবল বাড়ির আশেপাশে বসবাসকারীদেরকে বোঝানো হয়, বরং তোমাদের নিজের ভাইও প্রতিবেশীদের অন্তর্ভুক্ত, তারা যতই দূরে থাকুক না কেন ।

(মালফুযাত ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৫, প্রকাশকাল ২০০৩)

তিনি আরও বলেন-

“চরিত্রই সকল উন্নতির সোপান। আমার মতে এটি বান্দাদের অধিকার প্রদানের এমন একটি দিক যা আল্লাহতা’লার অধিকার প্রদানের দিকটিকে মজবুত করে। যারা মানুষের সঙ্গে উন্নত আচরণ করে খোদাতা’লা তার ঈমানকে নষ্ট হতে দেন না। মানুষ যখন খোদাতা’লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে এবং নিজ দুর্বল ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে তখন তার সেই আন্তরিকতার জন্য তার ঈমান দৃঢ় হয়ে যায়। কিন্তু এটি স্মরণ রাখা উচিত যে যদি কেউ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে উন্নত আচরণ করে তবে সেই আচরণ খোদাতা’লার সন্তুষ্টির জন্য হতে পারে না এবং এতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকার কারণে কোন লাভ হয় না। এমন অনেক লোক আছে যারা সরাইখানা ও পান্থশালা তৈরী করে দেয়। কিন্তু খ্যাতি অর্জনই তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। মানুষ যদি আল্লাহ তা’লার খাতিরে কোন কাজ করে তা যতই ছোট হোক না কেন আল্লাহতা’লা তাকে বিনষ্ট করে না এবং তাকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৬)

তিনি বলেন-

“ ভালভাবে স্মরণ রেখো! সম্পদ লাভ কি? সম্পদ লাভ হল এক প্রকার বিষ পান করা। এর বিষক্রিয়া থেকে সেই রক্ষা পেতে পারে যে আল্লাহ্ তা’লার সৃষ্টির প্রতি স্নেহশীলতার সঞ্জীবনী সুধা পান করে এবং আত্মশ্লাঘা থেকে বিরত থাকে।”

অতএব সম্পদ ও প্রাচুর্য লাভ হলেও তা তাদের জন্য বিষ নয় যারা আল্লাহ্ তা’লার সৃষ্টির প্রতি সদয়। সৃষ্টির প্রতি তাদের এই স্নেহ ও ভালবাসা অমৃত হয়ে যায়।

“ কিন্তু যদি সে অহংকার ও আস্ফালন করে তবে তার পরিণাম হল ধ্বংস। যদি এক পিপাসার্ত ব্যক্তি থাকে আর সেখানে একটি কুয়ো থাকে আর সে যদি দুর্বল ও অসহায় হয় আর পাশে একজন সবল মানুষ এই কারণে তাকে পানি না পান করায় যে, এর ফলে তার সম্মান হানি ঘটবে, সেই পুণ্য থেকে বঞ্চিত হবে। এর পরিণাম কি ঘটবে? সে পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং খোদা তা’লার ক্রোধভাজন হবে। তবে লাভ কি হল? এটি বিষ হল কি? সে নির্বোধ বুঝে ওঠে না যে সে বিষ পান করেছে, কিন্তু কিছু দিন পর বুঝতে পারবে যখন এটি তার ক্রিয়া দেখাবে এবং তাকে মেরে ফেলবে।

একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, গরীবদের অংশে একাধিক সৌভাগ্যের বিষয় রয়েছে। এই কারণে ধনীদের সম্পদ ও প্রাচুর্যের কারণে তাদের প্রতি ঈর্ষা করা উচিত নয়। এই কারণে যে, তারা সেই ধনের ধনী যা এই সব সম্পদশালীদের কাছে নেই। একজন দরিদ্র ও অসহায় মানুষ অহেতুক অন্যায়, অত্যাচার, অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, উৎপীড়ন করা, অধিকার আত্মসাৎ করা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের মন্দ কর্ম থেকে কোন পরিশ্রম ও সাধনা ছাড়াই সুরক্ষিত থাকে। কেননা, মিথ্যা অহংকার এবং আত্মকেন্দ্রীকতা যা তাদেরকে এই পথে চলতে বাধ্য করে, সেগুলি তাদের মধ্যে থাকে না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩৯)

বর্তমান যুগের অধিকাংশ গরীবরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা, আজকাল তারা ধনীদের সম্পর্কে ঈর্ষাপরায়ণ আর তারা তাদেরকে বিভিন্নভাবে অত্যাচারের লক্ষ্যেও পরিণত করে। আর বর্তমানে এরা সেই সমস্ত শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে যারা অপরের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। অতএব এখানে এমন লোকদের বোঝানো হয়েছে যারা আন্তরিকভাবেই অসহায় ও নিরীহ। আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসহায় হলেও তারা যেন নিরীহ হয়। এমন মানুষরা আল্লাহ্ তা’লার কাছে অত্যন্ত প্রিয় আর তারা আল্লাহ্‌র দরবারে অন্যদের তুলনায় আগেই মুক্তি লাভ করে।

অতঃপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- “ সম্পদ ও প্রাচুর্য এক প্রকার বাধা। ধনী ব্যক্তিকে কোন দরিদ্র ও তুচ্ছ ব্যক্তি যদি আসসালামো আলাইকুম বলে, তবে তাকে সম্বোধন করে কথা বলা এবং ওয়া আলাইকুম আস সালাম বলতে সংকোচ বোধ করে।”

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৮)

মহানবী (সা.) প্রত্যেক সালাম দাতার সালামের উত্তর দিতেন এমনকি অমুসলিমদের প্রতিও তিনি এই আচরণ করতেন। অর্থাৎ যদি কখনো ইহুদী তাঁকে সালাম করত তিনি (সা.) ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে উত্তর দিতেন। অনুরূপভাবে তিনি (সা.) একবার উটে চেপে কোথাও যাচ্ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.)ও সঙ্গে বসে ছিলেন। পথিমধ্যে এক ইহুদী জিহ্বা ঘুরিয়ে আসসালামো বলার পরিবর্তে আসাসামো বলে যার অর্থ ছিল তুমি ধ্বংস প্রাপ্ত হও। মহানবী (সা.) বললেন- আলাইকুম। হযরত আয়েশা (রা.) লক্ষ্য করেন নি যে, তিনি (সা.) ‘ওয়া’ শব্দটি উচ্চারণ করেন নি। তিনি (সা.) তোমার উপরও বলেন নি। তিনি বলেছিলেন, তোমার উপর হোক। হযরত আয়েশা (রা.) এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, হে রসুলুল্লাহ্! আপনি কি শোনেন নি যে, সে কি বলেছিল? সে আসসামো আলাইকুম বলেছিল। তিনি (সা.) উত্তর দিলেন- আমি যা উত্তর দিয়েছি সেটি তুমি শোন নি। আমি ওয়া আলাইকুম বলিনি। আমি বলেছিলাম আলাইকুম। (সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- “ খোদা তা’লা যদি কৃপা করেন আর ধনী ব্যক্তি নিজের সম্পদ ও প্রাচুর্য নিয়ে গর্ব না করে এবং সেটিকে খোদা তা’লার বান্দাদের সেবায় ও সহানুভূতির উদ্দেশ্যে ব্যয় করার সুযোগ পায় এবং নিজের কর্তব্য মনে করে তবে সে এক অশেষ কল্যাণের অধিকারী হবে। ”

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৪৩৯)

‘ধনী হয়ে দরিদ্রদের সেবা কর, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে তাদের সামনে অহংকার প্রদর্শন করো না। ”

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড--১৯, পৃষ্ঠা: ১২)

আরও বলেন- “ নিজের দুর্বল ভাইয়ের প্রতি দয়া কর, যাতে উর্দ্ধলোকে তোমাদের প্রতিও দয়া করা হয়।”

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড--১৯, পৃষ্ঠা: ২৭)

আল্লাহ্ তা’লা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর কাছে দলে দলে লোক আসবে আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হতেন না। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদেরকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাঁর জন্য দোয়া করতে প্রেরণা দেয়। তিনি একা যত পরিশ্রম করেছেন তা আমাদের কল্পনার অতীত। এতসব পুস্তক রচনা, প্রবন্ধ রচনা নিজের হাতেই করেছেন। এছাড়াও গরীব দুখীদের সেবা করেছেন, বাইরের অতিথিদের জন্য নিজের হাতে চারপাই পেতে দিয়েছেন। মোটকথা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সৃষ্টির প্রতি সেবা ও সহানুভূতির দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। গরীবদের প্রতি কখনও তিনি তিরস্কার করেন নি আর তাদের কারণে বিরক্ত বোধও করতেন। আপনারা এই ঘটনাটি নিশ্চয় একাধিক বার শুনেছেন যে, মিঞা নিযামুদ্দীন নামে এক দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। মসজিদে যখন খাদ্য বন্টন হচ্ছিল তখন সেখানে কেবল ধনীদের মধ্যেই খাদ্য বন্টন করা হল। সবার শেষে মিঞা নিযামুদ্দীনের পালা আসে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের তরকারী নিয়ে তার কাছে পৌঁছে যান এবং তিনি বলেন- এস নিযামুদ্দীন! আমরা একসঙ্গে খাই। অতএব এটিই হল মানুষের প্রতি মানুষের সহজাত স্নেহ ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ যার প্রতি আল্লাহ্ তা’লার স্নেহ-দৃষ্টি থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- “সাধারণ বৈঠকে ধনী ব্যক্তিদেরকে এমনিতেই তোষামোদ করা হয় এবং সকলে তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে। এই কারণে খোদা তা’লা দরিদ্রদের জন্য সুপারিশ করেছেন কেননা এই সব দুর্বলরা অজ্ঞাত জীবন যাপন করেন।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭০-৭১)

**********

**জামাতে আহমদীয়ার সমস্ত সদস্যকে ২০১৭ সালের কাদিয়ান জলসা সালানার প্রীতি ও শুভেচ্ছা**

**দোয়াপ্রার্থী:**

**মজলিস আনসারুল্লাহ্ ও খুদ্দামুল আহমদীয়া, মুলুক ও বোলপুর,বীরভুম ।**

সম্পাদকীয় -এর শেষাংশ ১-এর পাতার পর ...

অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন, এতটাই যে, মানুষের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই অবশিষ্ট ছিল না। হযরত মির্যা সাহেব নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করে খোদা তা'লাকে তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলী সহকারে পৃথিবীর মানুষের সামনে প্রকাশ করেন।" [১৯২৭ সালে কাদিয়ানের জলসা সালানায় উপস্থাপিত হযরত মুসলেহ মওউ (রা.)-এর ভাষণ] * আর যতদূর নগীগণের সম্পর্ক, " কেবল আওলিয়াউল্লাহ্, সুফিগণ এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারীরা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে নবীগণের সম্মান ও মর্যাদার বিরোধী ছিল। যদিও তাদের মধ্যে কিছু কিছু মানুষ কেবল সন্দেহ এবং সম্ভাবনাই ব্যক্ত করত, কিন্তু অনেকে আবার কার্যত নবীগণের প্রতি পাপ আরোপ করত আর তাতে দোষের কিছু দেখত না। হযরত ইব্রাহিম (আ.) সম্পর্কে তারা বলতেন যে, তিনি তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে বলত যে, তিনি চুরি করেছিলেন। হযরত ইলিয়াস (আ.) সম্পর্কে বলত যে, তিনি খোদার প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেন। দাঊদ (আ.) সম্পর্কে বলত যে, পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাকে পাওয়ার জন্য তার স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে হত্যা করিয়েছিলেন। এই ব্যধি এমন মহামারীর রূপ ধারণ করেছিল যে, হযরত মহম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সত্ত্বা পর্যন্ত এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পান নি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এগুলি সব ভ্রান্ত চিন্তাধারা আর যা কিছু বলা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা। নবীদের দ্বারা কখনো কোন পাপ সংঘটিত হতে পারে না।"

[১৯২৭ সালে কাদিয়ানের জলসা সালানায় উপস্থাপিত হযরত মুসলেহ মওউ (রা.)-এর ভাষণ]

* মুসলমানদের মধ্যে কুরআন মজীদ সম্পর্কেও অনেক ধরণের ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিপতিত ছিল আর এখনও রয়েছে। তেমনি একটি বিশ্বাস হল এর কোন কোন আয়াত কোন কোন আয়াতকে রহিত করে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে কুরআন মজীদ উপর মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে যায়। অনুরূপভাবে কুরআন করীম সম্পর্কে একটি ভয়াবহ বিশ্বাস পোষণ করা হত যে, এটি হাদীসের অধীন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কুরআন সম্পর্কে তৈরী হওয়া যাবতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের সংশোধন করেন।

* ফেরেশতাদের সম্পর্কেও ভ্রান্ত ধারণা দূর করেন এবং তাদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে অবগত করেন।

*দোয়া সম্পর্কে তিনি অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন এবং দোয়া গৃহিত হওয়ার বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করেন, অপরদিকে মুসলমানরা দোয়ার নিদর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, এমনকি সেই সময় স্যার সৈয়্যদ আহমদের মত খ্যাতনামা বিদ্বানও দোয়া গৃহিত হওয়া সম্পর্কে অস্বীকারকারী ছিলেন।

* মুসলমানদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে বার্তালাপ এবং ওহী লাভের পথ সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে গেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলাম বহির্ভুত এই বিশ্বাসের সংশোধন করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যুগের সংস্কারক হিসেবে অন্যান্য ধর্মের ভ্রান্তিসমূহকেও তাদের সামনে প্রকাশ করে দেন। কিন্তু ভালবাসা এবং পরম সহানুভুতি নিয়ে তাদের কাছে প্রমাণ করেন যে, ইসলামই প্রকৃত সমৃদ্ধি এবং মুক্তির প্রতিভু।

তিনি (আ.) খৃষ্টধর্মকে একত্ববাদের পাঠ দেন এবং তাদেরকে বোঝান যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা একজনই। ত্রিত্ববাদ বা তিন খোদার বিশ্বাস ভ্রান্ত এবং এটি প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। হযরত মসীহ (আ.) ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেন নি, না তিনি অভিশপ্ত হয়েছেন। তিনি (আ.) অভিশপ্তের প্রকৃতার্থ তুলে ধরেন এবং বলেন যে, যে ব্যক্তি অভিশপ্ত খোদার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক থাকতে পারে না। এর অর্থ হল সে খোদা সম্পর্কে উদাসীন এবং খোদাও তার সম্পর্কে উদাসীন। এমতাবস্থায় হযরত মসীহর মত মহান নবীকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করা তার উপর ঘোর অন্যায়। ক্রুশের ঘটনা থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জীবিত উদ্ধার করেন এবং পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে নাসীবাইনের পথে আফগানিস্তান হয়ে ভারতে পৌঁছান এবং একশ পঁচিশ বছর আয়ু লাভ করে মৃত্যু বরণ করেন আর শ্রীনগরের খানিয়ার মহল্লায় তিনি সমাহিত রয়েছেন।

যতদূর হিন্দুদের সম্পর্ক, তাদের সমস্ত সম্প্রদায়কে সামগ্রিকভাবে একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেন এবং বলেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অনু-পরমাণু খোদা তা'লার সৃষ্টি। খোদা তা'লা ছাড়া কোন বস্তু অনন্ত ও অনাদি নয়। দেহ থেকে আত্মা সকলই খোদার সৃষ্ট। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে দাপটের সাথে পুনর্জন্মের অবধারণার অপনোদন করেন। হিন্দুদের আর্য সমাজ নামে একটি সম্প্রদায় নিয়োগের মত ন্যাক্কারজনক প্রথার প্রচলন ছিল। তিনি এটিকে অমানবিক বলে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন, 'এটি কখনোই বেদের শিক্ষা হতে পারে না'।

মসীহ সম্পর্কে তিনি বলেন: " স্মরণ থাকে যে, ইঞ্জিলে হযরত মসীহর আগমণ সম্পর্কে দুই প্রকারের ভবিষ্যদ্বাণী আছে। একটি হল শেষ যুগে আগমণের প্রতিশ্রুতি যেটি আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ হবে এবং সেই আগমণ সেই ধরণের যে, যেভাবে মসীহর যুগে এলিয়া নবীর পুনঃ আগমণ ঘটেছিল। সুতরাং সে এই যুগে এলিয়ার মত এসে গেছে আর সে ব্যক্তি আমি ছাড়া ভিন্ন কেউ নয় যে মানবতার সেবক এবং প্রতিশ্রুত মসীহ এবং মসীহ (আ.) নামে আগমণ করেছে।"

(মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮)

তিনি বলেন:

" এ অন্ধকার যুগের আলো আমি-ই। যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ ও অনুবর্তিতা করে, তাকে সেসব গর্ত ও গিরি-গহ্বরে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করা হবে যা অন্ধকারে বিচরণকারীদের জন্য শয়তান তৈরী করেছে। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আমি শান্তি ও সহিষ্ণুতার সাথে মানুষকে সত্য খোদার দিকে পথপ্রদর্শন করি এবং তাদের মাঝে ইসলামের নৈতিক অবস্থাবলীর পুনর্বসান করি। তিনি আমাকে সত্যান্বেষীদের স্বস্তি লাভের জন্য ঐশী নিদর্শনাবলীও দান করেছেন ও আমার সমর্থনে তাঁর বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড দেখিয়েছেন এবং অদৃশ্যের বার্তা ও ভবিষ্যতকালে রহস্যাবলী আমার নিকট উন্মোচিত করেছেন। খোদা তা'লার পবিত্র গ্রন্থাবলী অনুযায়ী সত্যবাদীকে সনাক্ত করার মানদন্ড এটাই। আর তিনি আমাকে পবিত্র সূক্ষ্ম-তত্ত্ব ও জ্ঞান দান করেছেন। এই কারণে সেই সকল মানবাত্মা আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছে যারা সত্যকে চায় না এবং যারা অন্ধকারকে পছন্দ করে। কিন্তু আমি চাই যেন আমার সাধ্যানুসারে মানবজাতির প্রতি সহানভুতি প্রদর্শন করি। অতএব এ যুগে খৃষ্টানদের প্রতি সবচেয়ে বড় সহানভুতি হচ্ছে সেই সত্য খোদার দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যিনি জন্ম,মৃত্যু ও দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি সকল প্রকার ত্রুটি হতে পবিত্র সেই খোদা যিনি সূচনা-কালীন পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল বস্তু ও সত্তাকে গোলাকারে সৃষ্টি করে তাঁর প্রাকৃতিক বিধানে এ নিদর্শনা এঁকে দিয়েছেন যে, গোলাকারের ন্যায় তাঁর সত্তায় একত্ব ও দিকবিহিন সমাকৃতি রয়েছে। কাজেই মৌলিকভাবে একক বস্তুগুলোর কোন একটিকেও ত্রিভুজ করা হয় নি। অর্থাৎ প্রারম্ভিকভাবে খোদাত াত"লা যি কছু সৃষ্টি করেছেন, যেমন-পৃথিবী, নভমন্ডল, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি ও মৌলিক পদার্থ সবই গোলাকার। তাদের গোলাকৃতি তৌহিদের দিকেই নির্দেশ দিচ্ছে। অতএব খৃষ্টানদের প্রতি সত্যিকার সহানুভুতি ও প্রকৃত ভালবাসা তাদেরকে সেই খোদা তা'লার দিকে পথ-প্রদর্শন করার চেয়ে বেশি আর কিছু হতে পারে না, যাঁর হতে সৃষ্ট সকল বস্তু তাঁকে ত্রিত্ববাদ মুক্ত সাব্যস্ত করছে।

আর মুসলমানদের প্রতি সবচেয়ে বড় সহানুভুতি হচ্ছে, তাদের নৈতিক অবস্থার সংশোধন করা এবং একজন রক্তপাতকারী মসীহ ও মাহদী সম্পর্কে তাদের অন্তরে জমানো অলীক আশাকে নির্মূল করা। কেননা তা ইসলামী শিক্ষামালার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমি এই মাত্র লিখে এসেছি রক্তপাতকারী মাহদী এসে তরবারির জোরে ইসলামকে বিস্তার দেবেন বলে বর্তমানকালের এক শ্রেণী উলামার যে বিশ্বাস তা সবই কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থী। এগুলো কেবল প্রবৃত্তিমূলক কামনা-বাসনা মাত্র। একজন সচ্চেতা ও সত্যপরায়ণ মুসলমানের পক্ষে এসব ধ্যান-ধারণা থেকে বিরত হওয়ার জন্য কেবল এতটুকুই যথেষ্ট, সে যেন কুরআনের নির্দেশাবলীকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করে এবং একটু স্থিরভাবে লক্ষ্য করে, কোন ব্যক্তিকে ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য হত্যার হুমকি দেওয়া খোদা তা'লার পবিত্র কালামের কত বিরোধী।

(মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" খোদা তা'লা সমস্ত বিরোধীদেরকে নিরুপায় ও নিরুত্তর করে দেওয়ার জন্য আমাকে উপস্থাপন করেছেন আর আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, হিন্দু, খৃষ্টান এবং শিখদের মধ্যে এক ব্যক্তিও এমন নেই যে, ঐশী নিদর্শন, গ্রহণীয়তা এবং আশিসলাভের বিষয়ে আমার মোকাবেলা করতে